সু জো ঝা নী

বিমল মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই ফাল্গুন, ১৩৬৩

১ম সংস্করণ, ২২০০ সংখ্যা
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ,
২২০০ সংখ্যা
আশ্বিন, ১৮৭৯ শকাব্দ

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২, কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

"নদী কেবলই বলছে, আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হলো না।"

—রবীন্দ্রনাথ

এ কাহিনী লেখার তেমন কোনও প্রয়োজন হয়ত ছিল না। কিন্তু সংসারে প্রয়োজনটাই বড় আর সব তুচ্ছ এমন ধারণা আগে থাকলেও এখন আর নেই। আর, তা ছাড়া কোন্‌টা প্রয়োজন আর কোন্‌টা অপ্রয়োজন এ বিচার করতে গিয়ে বার বার যে কত ভুলই করে ফেলেছি তার হিসেবও আজ লিখে রাখিনি। নইলে হয়ত দেখতাম হিসেবটা একদিন পর্বত প্রমাণ হয়ে লোকসানের বেদনাটাই শুধু নয়, লাভের আনন্দটাও একেবারে আড়াল করে দিয়েছে। হয়ত আরও দেখতাম লাভ-লোকসানের অঙ্কের জটিলতায় জড়িয়ে গিয়ে আসল জীবনটাই কখন খোয়া গিয়েছে। সুতরাং প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা থাক, আমার কাহিনী আরম্ভ করি।

কিন্তু আরম্ভের আগেও একটু গৌরচন্দ্রিকা আছে।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশম্‌-এর আরম্ভে লিখেছেন : ক্ক সূর্য-প্রভবো বংশঃ ক্ক চাল্প বিষয়া মতিঃ কোথায় অতি বৃহৎ সূর্যবংশ আর কোথায়ই বা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি! আমি অজ্ঞানবশতঃ যেন ভেলার দ্বারা দুস্তর সমুদ্র পার হতে যাচ্ছি!

আজ কাঞ্চন-কামিনীর কথা লিখতে গিয়ে আমারও সেই দশা! এ কাঞ্চন-কামিনী একদিন কত রাজা-মহারাজার, কত জমিদারীর, কত রাজ্যের পতন অভ্যুত্থানের কারণ হয়ে উঠেছিল, আমি তার বিবরণ কি ঠিক তেমন করে দিতে পারবো! যার শেষটুকুই শুধু জানি, শুরুটা যার দেখিনি, যার পরিণতি বিয়োগান্ত কি মিলনান্ত বলবো আজো বুঝতে পারিনি, তার কথা বলা কি অত সহজ! আর এ-ছাড়াও আর একটা কথা আছে।

মনে আছে আমার ছোট ছেলে একদিন এক কাবুলিওয়ালাকে কাঁদতে দেখে হেসে ফেলেছিল। মনে আছে, আমিও ছোটবেলায়

এক চীনেম্যানের গান শুনে হেসেছিলাম। আমাদের প্রচলিত চেনা জগতের সঙ্গে খাপ না খেলেই বোধহয় আমাদের রসবোধে তা আঘাত করে। নইলে অন্যকে যা কাঁদায় আমাকে তা হাসায় কেন! একজনকে যা অভিভূত করে, অন্য একজনকে তা স্পর্শ করে না কেন! মেঘ দেখলে সকলেই আনন্দ পাবে এমন কথা নেই, কিম্বা সূর্য উঠলে সকলেরই জাগবার পালা এমন আইনও নেই। গ্রীষ্মকালে যখন সবাই গলদ্‌ঘর্ম, এমন দিনে দুপুর বেলা এক সাহেবকে গরমের কোটপ্যান্ট পরে দিব্যি আরামে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখেছি। আমি চা খাই না, অথচ আমার স্ত্রীর চা না হলে চলে না। অথচ এক ঘরে এক সঙ্গেই তো বাস করছি। পরমহংসদেব বলতেন—কারোর ঘড়ির সঙ্গে কারোর ঘড়ি মেলে না—তা বলে সময় কি আটকে আছে!

তবু সন্দেহ হতো! আমার যা ভাল লাগে, তা যদি সকলের ভালো না লাগে! আমার সেতারে যে সুর বাঁধি, তোমার মনের তারে যদি তার প্রতিধ্বনি না জাগে! আমি যাকে নিয়ে গল্প লিখবো—তাকে যদি তোমরা না চিনতে পারো! তার আনন্দ-বেদনায় তোমাদের আনন্দ-বেদনার যদি সাড়া না পাই! কতদিন ভেবে ভেবে দেখেছি—কই, এ নিয়ে তো কেউ লেখেনি কখনও। তোমার আমার কথা, তোমার আমার প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর কথা, তোমার আমার দোষের গুণের কথাই তো সবাই লিখেছে! রাজা মহারাজা রাজাধিরাজা আর রাণী পাটরাণী মহারাণীর কথাই তো সবাই লিখেছে। প্রজা পাঠক খাতকের কথা লিখেছে, চাষী মজুর কুলীর কথা লিখেছে। মেয়ে জামাই শাশুড়ীর কথা লিখেছে, ঘরের, বাইরের, স্বদেশের বিদেশের কথাও লিখেছে! কিন্তু কই, এ গল্প তো কেউ লেখেনি!

বাঙলা সাহিত্যে এ-গল্প যখন কেউ-ই লেখেনি, তখন আমি লিখবো এমন কী মহালেখক হয়েছি আমি! তাই বার বার লেখবার

চেষ্টা করেও বার বার পেছিয়ে গেছি। ভেবেছি ওদের দেশের মানুষের কথা ওদের দেশের লেখকরা লিখুক, আমি লিখবো আমার দেশের মানুষের কথা। ওদের দেশে কি আমি গিয়েছি কখনও। আর কারো দেশে গিয়েই কি সে দেশের মানুষের কথা লেখা যায়। দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ না থাকলে কি দেশকে চিনেছি বলা যায়। পঞ্চাশ বছর এক শয্যায় শুয়েও তো অনেকে নিজের স্ত্রীকেও চিনতে পারে না! আর শুধু কি চেনা—এ যে চেনানো! আমার চেনার সঙ্গে তোমার চেনার একাকার করানো। তুমি না চিনলেও তোমার মনে হবে—চিনেছি। তখন আমার চেনায় আর তোমার চেনায় কোনও তফাত থাকবে না! সে কি পারবো!

অলোকেশদা'কে চিনতাম, অলোকেশদা'র বাবাকেও চিনতাম, অলোকেশদা'র মাকেও চিনতাম। কিন্তু অলোকেশদা'র স্ত্রীকে! সেই কাঞ্চন-কামিনীকে! সে যে মেমসাহেব। শাড়ী পরলেও মেমসাহেব, সিঁদুর পরলেও মেমসাহেব, আলতা পরলেও মেমসাহেব। খাঁটি বিলিতী মেমসাহেব। যে মেমসাহেবদের আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলে, চৌরঙ্গীতে এই সেদিনও দেখেছি—। যাদের দেখেই দূরে সরে গিয়েছি, যাদের বিজাতীয়ত্ব আমাদের বরাবর পর করে রেখেছে—এও যে সেই জাতের মেমসাহেব! তাকে কি ছাপার অক্ষরে আপনার করে ফোটাতে পারবো!

আমাদের ইস্কুলের মাষ্টার রোহিনীবাবু বলতেন—বলো তো, বাঙলা দেশের কোন্ জেলায় রেল লাইন নেই?

রোহিনীবাবু ছিলেন ভূগোলের মাস্টার। ম্যাপ-এর দিকে দেখিয়ে বলতেন—বলো তো কৃষ্ণনগর কোথায়? সারা ম্যাপটা খুঁজে খুঁজে কোথাও কৃষ্ণনগরের সন্ধান পেতাম না। লাল নীল হলদের তরঙ্গে আমার চোখ ঝাপসা দৃষ্টিহীন হয়ে যেত। অকূল পাথারে পড়তাম আমি।

কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করতেন—বলো তো, ইংলণ্ডের রাজধানী কী?

কিম্বা লণ্ডনের কোন্ অংশে ভিন্সেন্ট্ স্কোয়ার? সেখানে শীতের রাতে কতখানি বরফ পড়ে? অথবা সেখানে লিস্টার স্কোয়ারে কারা বাস করে? লিস্টার স্কোয়ারের চৌমাথার বাড়িটাতে কারা থাকে? তাদের নাম কী? তারা ক'ভাই বোন? তাদের দিদি নোরা স্মিথের সঙ্গে কলকাতার অলোকেশ মিত্রের সম্পর্ক কী? আমি সব প্রশ্নের জবাব টপ্ টপ্ করে দিতে পারতাম! ভিন্সেন্ট্ স্কোয়ারের বস্তিতে যেসব ছেলেমেয়েরা থাকে তারা কী রকম জামা-কাপড় পরে তাও আমি জানতাম। বড় রাস্তার দোকানের শো-কেসে টাঙানো মোজা-গাউন-এর কত করে দাম তা-ও আমার মুখস্থ!

অথচ আমি তো ভিন্সেন্ট্ স্কোয়ারে যাইনি। এমনকি বাঙলা দেশ ছেড়ে বাইরেই তখন কোথাও যাইনি। এক আমার দূর-সম্পর্কের জ্যাঠামশাই-এর ছেলে অলোকেশদা' ছাড়া কেউ বিলেতেও যায়নি। তবু সব আমার জানা, সব আমার মুখস্থ!

কিন্তু বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কেমন সব বদলে যায়। এতদিন অলোকেশদা'র মেমসাহেব বউ-এর কথাও ভুলতে বসেছিলাম। কংগ্রেস, পাকিস্তান, ধর্মঘট, কত ঘটনা ঘটে গেল পৃথিবীতে। পৃথিবীর বড় বড় ঘটনার চাপে ছোট সংসারের ছোট ছোট মানসিকতা কোথায় চেপ্টে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেল—কেউ তার হিসেব রাখলে না। আমিও রাখিনি। আমিও আর পাঁচজনের মত পৃথিবীর পাঁচ-মিশেলিতে অন্য রকম হয়ে গেলাম। আমিও বড় হলাম, আমারও সংসার হলো।

তারপর একদিন

একদিন রাজপুতানায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

আজমীর থেকে আবুরোড এক রাত্তিরের পথ। রাত্রে খেয়ে দেয়ে ট্রেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়ো, সকাল আটটা নটা নাগাদ এসে পৌঁছুবে

আবুরোড স্টেশনে। মাঝখানের মরুভূমি পাহাড় যা কিছু সব পেরিয়ে এসে একেবারে সবুজের সমারোহ !

কোথায় থাকবো, কোথায় যাবো কিছুই ঠিক ছিল না। অথচ আবুরোডে স্টেশনে নামবার আগে সেই কথাটাই ঠিক করে নিচ্ছিলাম। কিন্তু ট্রেন থেকে যখন নামলাম তখন সব বেঠিক হয়ে গেল।

কোনও রাজা-মহারাজার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালপত্র নেমেছে বোধ-হয়। প্ল্যাটফরমের যত কুলি সব তাই নিয়ে ব্যস্ত, অগত্যা নিজের স্যুটকেশ আর বিছানার বাণ্ডিলটা নিজেই টেনে প্ল্যাটফরমে নামালাম। তারপর এদিক-ওদিক চতুর্দিকে একটা কুলির আশায় অসহায়ের মত দেখছি। দেখছি বটে কিন্তু এদিকে কারো নজর নেই !

ওদিকে তখন সোনা-রুপো মোড়া তাঞ্জাম এসে গেছে। লোক-লস্কর, সেপাই-পেয়াদা। হাতে সব মোটা লাঠি। রাজপুতদের অদ্ভুত পোশাক-পরা লাল নীল, রঙিন ধুতি ঘাগরা-পরা পুরুষ-মেয়েতে প্ল্যাটফরম ভর্তি। পেছনের লাগেজভ্যান থেকে বড় বড় প্যাঁটরা নামছে। আর কী সব সাইজ ! লোকে [illegible] চড়ে হাল্কা জিনিস-পত্র নিয়ে। এদের কাণ্ডই আলাদা। চা[illegible] পেতলের খাঁচাতে পাখী, তিনটে বেড়াল, দুটো কুকুর। ·

একজন টিকেট চেকারকে ডাকতে গেলাম—শুনিয়ে চেকারজী।···

কিন্তু তখন কে-কার কথা শোনে। স্টেশন-মাস্টার নিজে এসে দাঁড়িয়ে তদারক শুরু করেছেন। গার্ডসাহেব লাল ঝাণ্ডিটা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। দেখলাম এখানে কারোর সাহায্য চাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। কলকাতার এক বন্ধু বলেছিল—আবু রোডে গিয়ে স্টেশনের বাইরে বাসের টিকিট কেটে নেবেন, তারপর হোটেল বলুন, ধর্মশালা বলুন সব আছে। একটা ভালো দেখে গাইড নেবেন, আর কোনও ভাবনা নেই—

ভাবছিলাম শেষকালে হয়ত বাসও যথাসময়ে ছেড়ে দেবে, সমস্ত

দিনের মত এখানেই পড়ে থাকা। আবার যদি বিকেলবেলা কুলিরা আসে তখন বাস পেলে পাওয়া যেতে পারে।

হঠাৎ মাথায় বিরাট পাগড়ি পরা একটি লোক হাতে একটা লাঠি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো, বেশ সসম্মানে সেলাম করলো। তারপর সামনের দিকে একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে—হুঁজুরাইন ভেজা।

হুঁজুরাইন! কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলাম। হুঁজুরাইন কে! কীসের চিঠি! আবার জিজ্ঞেস করলাম -হুঁজুরাইন কে?

কিন্তু চিঠিটা পড়ে সন্দেহ ঘুচলো।

চিঠিতে লেখা আছে—"ঠাকুরপো, তুমি এখানে এসেছ দেখলাম, আমিও এখন এই গাড়িতে এসে পৌঁছেছি। তোমার হোটেলে ওঠবার দরকার নেই, আমার গাড়ি এসেছে, এই লোকের সঙ্গে চলে এসো, তারপর আমার হাওয়া-মহলে থাকবার ব্যবস্থা করবো। সেখানেই দেখা হবে। —তোমার সাহেব-বৌদি।"

লোকটা বললে—বড়ে রাজাসাহেব আসতে পারেন নি,—

জিজ্ঞেস করলাম—রাজাসাহেব কোথায়?

—ফতেগড়ে।

তারপর বললে—চলিয়ে হুঁজুর, হুঁজুরাইনের গাড়ি তো তৈরি—

তারপর কোথা থেকে দুজন লোক ডেকে নিয়ে এসে মালপত্রও মাথায় তুলে দিলে। চেয়ে দেখি প্ল্যাটফরমের ওপর থেকে বাক্স-প্যাঁটরা কুকুর বেড়াল সব পরিষ্কার। তাঞ্জামের চারিদিকে ঝালর পড়ে গেছে। তাঞ্জাম আটজন বাহকের কাঁধে চলতে শুরু করেছে।

বাইরে বাস, মটর, টাঙ্গার আড্ডা। সেখানে সমস্ত ভিড়ের পাশ কাটিয়ে লোকটা একটা বিরাট মটরে আমায় উঠিয়ে দিলে। মালপত্র কোথায় উঠলো তা আর দেখবার দরকার নেই। দেখলাম—দূরে আর একখানা বিরাট গাড়ির সামনে তাঞ্জাম থেকে নামলো মস্ত ঘোমটা দেওয়া শলমা-চুমকির ওড়না-ঢাকা মূর্তি। সোনালী চটি পরা পায়ে।

পাতলা ওড়নার ওপর রোদ পড়াতে ভেতরের হীরে পান্নার গয়- গুলো চিকচিক করে উঠলো। তারপর পর-পর চারখানা গাড়ি একে একে ছেড়ে দিলে। সামনে পেছনে দুখানা গাড়ি। মাঝখানে হুঁজুরাইনের আর তারপর আমার।

এই এতদিন পরে এতবছর পরে আবার যে সাহেব-বৌদির সঙ্গে হঠাৎ এমন জায়গায় দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

সে-দৃশ্যটা আজো আমার চোখে ভাসছে। আর ভাসছে সাহেব-বৌদির সেই চেহারা! লম্বা সাড়ে পাঁচ ফুট। ফরসা দুধের মত সাদা গায়ের রঙ। গালে একটা ব্রণও নেই কোথাও। মোটা ফোলা ফোলা ঠোঁট, চোখের পাতা আর হাতের আঙুল। সে-আঙুলের ডগায় রঙ করা লম্বা লম্বা নখ। আর সেই ননীর মত মুখের ওপরে ছোট একটু কপাল আর সেই কপালের ওপর একমাথা সোনালী চুল, বাঙালী মেয়েদের মত সিঁথি কাটা, আর সেই সিঁথিরই ডগায় ছোট করে একটু সিঁদুরের দাগ! এ চেহারা আমার মনের আমার ধ্যানের সঙ্গে এমন ভাবে মিলে গিয়েছিল যে এ রূপ আমি ভুলতে পারবো এ আমার ধারণাও হয়নি। কিম্বা এ-রূপ চিনতেও যে আমার কষ্ট হবে তাও জানতাম না।

কালিদাস রূপবর্ণনায় এত পটু ছিলেন, কিন্তু রঘুবংশম্-এর পাতায় জনক-দুহিতার রূপ বর্ণনা করতে এত কার্পণ্য করেছিলেন কেন কে জানে। সীতা-চরিত্রেরই বোধহয় এত রূপ ছিল যে তাঁর দেহের রূপ সেখানে লঘু হয়ে গিয়েছিল। নইলে বরাহরূপী ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক প্রলয়-পয়োধি থেকে উদ্ধৃত ধরিত্রী দেবীর মত কিম্বা বর্ষাঋতুর শেষে মেঘপুঞ্জ থেকে মুক্ত শরতের জ্যোৎস্নার মত —এইটুকু বলেই শেষ করে দিয়েছেন কেন! যেন আর না বললেও চলে—বেশি বলা যেন বাহুল্য!

সাহেব-বৌদিকে দেখে কিন্তু আমারও সেদিন তাই মনে হয়েছিল। সেই যেদিন অলোকেশদা' মেম বিয়ে করে নিয়ে প্রথম বাড়িতে

এসেছিল। এর আগে কোনও মেম-সাহেবকে বাড়ির বৌ-এর পোশাক পরতে দেখিনি। তখন ভালো করে শাড়ি পড়তেও শেখেনি, ঘোমটা দিতেও শেখেনি।

কিন্তু যেদিন আবার অন্য পোশাকে দেখলাম!

সত্যি সে একেবারে অন্য পোশাক! সাহেব-বৌদিকে আমি কত রকম পোশাকে কত বার দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। আর প্রত্যেক-বার পোশাক বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাও যে কতবার আমূল বদলে গিয়েছে তারও বুঝি ইয়ত্তা নেই।

এইবার আসল ঘটনাটা বলি।

মনে আছে সাহেব-বৌদি বলত—লণ্ডনে আমাব বাবাব দুটো গাড়ি ছিল, বাবা রোজ সকালে আমাকে গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যেত—একপাশে বাবা বসতো আব একপাশে মা—

—আর তুমি?

ভিনসেণ্ট স্কোয়ারের অনেক গল্প শুনেছিলাম সাহেব-বৌদির কাছে। যেদিন খুব বরফ পড়তো সেদিন ঘরের বাইরে বেরোন চলতো না। ঘরে বসে সেদিন কফি খেয়ে শুধু মাব কাছে গল্প শোনা। মার চেহারা ছিল মোটাসোটা। সব ভাই বোন মিলে ঘিরলেও মাকে জড়িয়ে ধরা যেত না। আর আসতো কত ছেলে। গল্প করতে আসতো তারা। অনেক দূর দূর থেকে আসতো। সাহেব-বৌদিকে না দেখলে তাদের রাত্রে ঘুম হতো না। সবাই বলতো—সাহেব-বৌদির সঙ্গে বিয়ে না হলে তারা আত্মহত্যা করবে।

জিজ্ঞেস করতাম—তাহলে দাদার সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কি করে সাহেব-বৌদি?

তখন আমি খুব ছোট। ছোট মাসিমার চোখ দুটো গোল হয়ে গেছে অলোকেশদা'র বৌ দেখে। বলে—গাল দুটো কী ফরসা ছোড়দি কী বলবো—ঠিক আপেলের মতন—দেখলেই মনে হয় দিই টিপে—

বড় জ্যাঠাইমা বললে—বউ দেখে এলাম ভাই—আহা—

মা তখনও দেখেনি। বললে—কী রকম দেখলে বড়দি? সিঁথিতে সিঁদুর আছে?

রাঙা-কাকীমা বললে—ওমা, হাতে আবার শাঁখা পরেছে দেখলুম, যেমন গায়ের রঙ তেমনি গয়না পরে কচিকলাপাতা-রঙের বেনারসীতে এমন মানিয়েছে—পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করলে আবার।

বড়-জ্যাঠাইমা বললে—ঠিক যেন পটে আঁকা জগদ্ধাত্রী ভাই, কী রূপ—ঠিক যাকে বলে কাচকামিনী।

মা বললে—আসলে তো মেমসাহেব—কী বলো—ফরসা হবে না তো কালো হবে নাকি!

রাঙা-কাকীমা বললে—মেমসাহেব হলেই কি ফরসা হয় ভাই—আমার বাপের বাড়ির পাশের বাড়ির ছোট ছেলে বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে আনলে, আহা যেমন রঙ তেমনি গড়ন, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে চা খেতো—শেষে শাশুড়ীর কত হেনস্থা, বউএর সেবা কপালে নেই, বছর ঘুরতে না ঘুরতে মাগী মরে বাঁচলো—

রাঙা-কাকীমার বাপের বাড়ির পাশের বাড়ির ছোট ছেলের বউ সম্বন্ধে আমার কেন কৌতূহল হলো কে জানে। আমিও মা'র পাশে বসে গল্প শুনছিলাম। বললাম—তারপর কী হলো রাঙা-কাকী?

এতক্ষণ আমার দিকে কেউ নজর দেয় নি।

রাঙা-কাকী বললে—ওমা তুই বুঝি সব শুনছিস্? দুষ্টুর সব কথায় কান দেওয়া চাই—

আমার কিন্তু তখন আরো কৌতূহল বেড়ে গেছে। বললাম—বলো না রাঙা-কাকীমা, তার পর কি হলো?

রাঙা-কাকীমা তখন সে-প্রসঙ্গ ভুলে গেছে। বললে—কীসের কী হলো রে?

বললাম—তোমার বাপের বাড়ির পাশে সেই মেম-বৌ-এর?

বড়-জ্যাঠাইমা বললে—সেই কথা মনে মনে ভাবছিস্ বুঝি তুই ? ছ্যাখো ছেলের বুদ্ধি, ও-ও বড় হয়ে ঠিক মেম বিয়ে করবে, দেখিস্ তুই—

মা বললে—হ্যাঁ, করবে, মেম আনলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো না— ! হেঁসেলে গরু মুরগী ঢুকতে দিচ্ছি আমি—

—তা ছেলের যদি পছন্দ হয়, তুই কি করবি লা ?···

মা বলতো—কেটে ফেলব না অমন ছেলেকে, সাতজন্ম বাঁজা হয়ে থাকবো সে-ও ভালো, তবু মেম-বৌএর সেবা করতে পারবো না মা, রক্ষে করো—

রাঙা-কাকী বলতে লাগলো—তা সেই মেম-বৌ এর আবার কত আদিখ্যেতা, ভাই-এ ভাই-এ এখন সব ভেন্ন হয়ে গেছে, মেম-বৌ এর সোহাগ করতে গিয়ে বাড়িও বাঁধা পড়েছে, এখন আবার সেদিন বাপের বাড়ি গিয়ে শুনি মেম-বৌ ভাতারের মুখে লাথি মেরে বিলেত চলে গেছে—···

মা বললে—ও অলোকেশের বৌ-ও চলে যাবে দেখে নিও, এই বলে রাখলুম, কেউটে সাপ কখনও দুধ কলায় পোষ মানে—

বড়-জ্যাঠাইমা বললে—যাই আবার, শাড়ি সেমিজ কেচে ফেলিগে—পায়ে হাত দিয়ে আবার পেন্নাম করেছে—ঘেন্না করছে বড়—হাজার হলেও ম্লেচ্ছ তো ওরা—

কিন্তু অলোকেশদা'র ভাগ্য ভালো।

সেজ জ্যাঠামশাই তখন বেঁচে। এককালে খুব শৌখীন লোক ছিলেন। ছুঁচলো গোঁফ ছিল ঠোঁটের দুপাশে। শুনেছি নাকি যখন বয়েস কম ছিল তখন ভালো তবলা বাজাতেন। তারপর বড়বাজারে আড্ডা দিতে গিয়ে কেমন করে একবার তুলোর কারবারের দিকে নজর পড়ে যায়। সেই তুলোতে সামান্য কিছু টাকা ফেলে প্রথম যুদ্ধের সময় অনেক টাকা করেছিলেন। বাড়ি কিনেছিলেন, গাড়ি করেছিলেন। তুলোই তাঁকে উঁচুতে তুলে দিয়েছিল বটে কিন্তু সম্মান

বেশি পাননি। বলতে শুনতে তো ভালো নয়। কী করেন?—না তুলোর ব্যবসা।

ছেলেকে বলতেন—তা তুলোর ব্যবসাই যে সারাজীবন করতে হবে তোমাকে এমন কোন কথা নেই—

লোকে বলতো—ওই দেখ, তুলো হেন জিনিস, তাতেই এত পয়সা—

বাড়িটা দেখিয়ে বলতো—ও তুলোওয়ালার বাড়ি—

ইস্কুলে আড়ালে আবডালে অলোকেশকে দেখিয়ে বলতো—ওই যে, ও আমাদের তুলোওয়ালার ছেলে—

বাইরে সেজ-কাকা বাবা কাকাদের বলতেন—তোমরা কেবল চাকরিই করে গেলে, ব্যবসার মর্ম তো বুঝলে না—তুলোই হোক আর তিসিই হোক, পয়সা হলেই প্রেস্টিজ—

সেজ-জ্যাঠাইমা বলতেন—ছেলেকে তা বলে তোমার তুলোর ব্যবসাতে ঢোকাতে দেব না আমি—

সেজ জ্যাঠাইমার এক ছেলে। অলোকেশ। স্বামীকে ছেলের নাম রাখতে দিলেন না। বললেন—তুমি নাম রাখলে লোকে বলবে তুলোওয়ালার ছেলে তো, নাম শুনেই বুঝেছি—

নিজের বাপের বাড়িতে গিয়ে কোন কবি না সাহিত্যিককে চিঠি লিখে নামকরণ করেছিল। সেই ছেলে বড় হ'ল। সেই অলোকেশ আই-এ বি-এ পাশ করল। তারপর সেজ-জ্যাঠামশাই তাকে বিলেত পাঠালেন ব্যারিস্টারি পড়াতে। বলতে গেলে তা-ও সেজ-জ্যাঠাইমার পীড়াপীড়িতে।

একবছর তু'বছর কেটে গেল। ছেলে ফেরে না।

রাস্তায় কেউ দেখা হলে জিজ্ঞেস করে—অলোকেশ কবে ফিরছে মিত্তির মশাই? সেজ-জ্যাঠামশাই বলেন—এই সামনের জানুয়ারি মাসে—

তবু অনেক জানুয়ারি মাস একে একে এসে ফিরে গেল।

তখন বলতে লাগলেন—যতদিন থাকে ততই তো শিখতে পারবে, জানতে পারবে, মানুষ হয়ে আসুক, এসেই তো সেই সংসার আর হিসেব, নিজে সংসার করে দেখছি তো · তারপর বিয়ে ছেলেপুলে—অনেক লেঠা—

কিন্তু তুলোর বাজারে কী হ'ল কে জানে, কিম্বা হয়ত শরীরে আর পরিশ্রম পোষাল না, সেজ-জ্যাঠামশাই দোকান তুলে দিলেন। গাড়িটা বেচে দিলেন। সারাদিন বাড়ি থাকেন আর সন্ধ্যাবেলা লাঠি নিয়ে একটু বেড়াতে বেরোন। বাত দশটা হতে না হতে বাড়ির আলো নিভে যায়। স্বাস্থ্য পড়ে এল। দুপাশের ছুঁচলো গোঁফ একটু ঝুলে এল। ঘুম থেকে উঠে আবার হাই তোলেন। যদি নেহাত বেরোতে হয় তো ধুকুস্ ধুকুস্ করতে করতে যান পোস্টাপিসের দিকে। গিয়ে লণ্ডনে ছেলের নামে মনিঅর্ডার করেন, টাকা রেজিস্ট্রি করেন।

সতীবিলাসবাবু চশমাটা নাকে তুলে প্রশ্ন করেন—ছেলে ফিরছে কবে মিত্তিরমশাই ?

সেজ-জ্যাঠামশাই বলেন—এই আসছে আগস্ট মাসের শেষাশেষি।

তা ছেলে ফিবলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আগস্ট মাসের শেষাশেষি নয়। জানুয়ারি মাসেও নয়, আগস্ট মাসেও নয়, একেবারে তিন বছর পরে বৌ নিয়ে। একেবারে মেম-সাহেব বৌ।

কিন্তু সেজ-জ্যাঠামশাই তখন মারা গেছেন। সেজ-জ্যাঠাইমা তখন বেঁচে আছেন বটে কিন্তু মরে যাওয়াই হয়ত তাঁর ছিল ভাল।

পাড়ার মেয়েরা বলতো—এইবার ছেলের বৌ এসে তোমার সেবা করবে দিদি—

সেজ-জ্যাঠাইমা বলতেন—এ কি আর আমাদের কাল মা—এখন বৌ-এর সেবা করে কে তাই দেখো—

কথাটা জ্যাঠাইমার কিন্তু মেম-সাহেব বৌ দেখে ধড়ে যেটুকু প্রাণ ছিল তাও উবে গেল।

অলোকেশদা'র বুদ্ধি ছিল। হাওড়া স্টেশনে নেমে বেনারসী শাড়ি কিনেছে, শাখা, সিঁদুর সব কিনেছে। একেবারে পরিপাটি করে বৌকে সাজিয়ে নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির। হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল বৌ-ঝির দল। এ-বাড়ি ও-বাড়ি, এ-পাড়া ও-পাড়া, কিছু বাদ গেল না। হাঁ করে সবাই চেয়ে দেখে মেম-সাহেবের মুখের দিকে। বাঙলা কথাই বোঝে না তা কথা বলবে কি !

মেম-সাহেব বৌ কেমন আড়ষ্ট হয়ে শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। দেখে কারো মুখে হাসি আর ধরে না।

সেজ-জ্যাঠাইমা চোখের জল ফেলেন আর বলেন—সেবা করবে কি মা, কথাই বোঝে না আমার, জলের ঘটি চাইলে চায়ের কাপ এনে দেয়—মরণ হয়েছে আমার—

মরণ হ'ল সেজ-জ্যাঠাইমার কিন্তু পাড়ার লোকেদের খোরাক জুটল প্রচুর।

এ বলে—ওদের বাড়ির মেম-সাহেবের নতুন খবর কী ভাই !

ও বলে—শুনলাম মেমসাহেব নাকি বাংলা শিখছে—

একজন বলে—শুনলাম, রাঙাদি বলছিল মেমসাহেব নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি খায় ?

আর একজন বলে—আমি শুনলাম অলোকেশদা' নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে দোকান থেকে টিনে ভরা গরুর মাংস এনে খাওয়ায়—

কেউ বলে—তা কি করবে বলো মা, বিড়ি খাওয়া যদি অভ্যেস হয় তো খাবে না ? এই যেমন আমাদের চায়ের নেশা—

দাদা গিয়েছিল একদিন অলোকেশদা'র বাড়িতে। এসে বললে —এই দেখ—চকোলেট—

এক মুঠো চকোলেট দেখিয়ে একটা মুখে পুরে দিলে নিজে।

বললাম—কে দিলে রে ?

দাদা বললে—সাহেব-বৌদি—

সাহেব-বৌদি! আমারও সাহেব-বৌদিকে ভারি দেখতে ইচ্ছে হলো। সকলের মুখে সাহেব-বৌদির কথা শুনে শুনে চোখের সামনে সাহেব-বৌদির একটা মন-গড়া চেহারা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। মনে হতো ননীর মত তুলতুলে গা, দুধে আলতা রঙ। বেনারসী শাড়ি পরা কপালে সিঁদুরের টিপ। জ্যাঠাইমার দেওয়া নাম—কাচকামিনী, কাঞ্চনবর্ণ শরীর।

কিন্তু ভারি লজ্জা হতো আমার সাহেব-বৌদির কাছে যেতে।

সেজ-জ্যাঠাইমা যেদিন মারা গেলেন সেদিন দূর থেকে দেখেছিলাম।

অলোকেশদা' কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। দেখলাম—সাহেব-বৌদিও যেন সব দেখে শুনে কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। এমন ব্যাপার তো দেখেনি কখনও। একমাস ধরে অশৌচ চললো। অলোকেশদা'র কোর্টে যাওয়া বন্ধ।

লোকের কিন্তু সেদিকে নজর নেই, সকলের কৌতূহল সাহেব-বৌদির সম্বন্ধে!

বলে—মেম-সাহেবও নাকি অলোকেশের সঙ্গে হবিষ্যি করছে?

বড়-জ্যাঠাইমা বললে—তাই তো দেখলাম ভাই, মাটির মালসায় মটর ডাল, আলোচাল, আর কাঁচকলা সেদ্ধ দিয়ে খাচ্ছে—চাকর-বাকরকে ছুঁতে দেয় না—

অনেকে বিশ্বাস করে না। বলে—এ-সব লোকদেখানি, ঘরে খিল দিয়ে ঠিক টিনের মাংস খায়—

রাঙা-কাকীমা বলে—তা হলে সন্ধ্যেবেলা মটরে চড়ে কোথায় যায় শুনি? নিশ্চয় হোটেলে গিয়ে গিলে আসে—

বাবা বলতো—বলা যায় না, এক-একজন মেম-সাহেব ও-রকম হয়, আমাদের অফিসের ডিকিনসন্ সাহেবের বউ কালীপূজোর পেসাদ খেতো—

মা বলতো—তা হলে মেয়ে-পেল্লাদ, দৈত্যকুলে মেয়ে-পেল্লাদ জন্মেছে গো।

অলোকেশদা' তখন বেঁচে। ইস্কুলের ছুটি। মাও কখন বই পড়তে পড়তে চোখ বুজেছে। খিড়কির দরজা দিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলাম সেজ-জ্যাঠামশাইএর বাড়িতে। সদর দবজা খোলাই ছিল। সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে উঠে গেলাম। কেউ কোথাও নেই। অলোকেশদা'ব ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কেমন যেন ভয় ভয় কবতে লাগলো। আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে যেন কে ধরে ফেলেছে।

বললে—হোয়াট্? নাউ?

পেছন ফিরে চেহারা দেখেই আমার সমস্ত শবীর ঠাণ্ডা হয়ে এল।

সাহেব বৌদি!

বললে—কাম্ ইন্—

বললাম—আমি ইংরিজী জানি না—

সাহেব-বৌদি ততক্ষণে আমার হাত ধরে একেবারে ঘরের ভেতর নিয়ে গেছে, নিজে একটা চেয়ারে বসে আমাকে সামনের চেয়ারে বসালে।

সাহেব-বৌদি বললে—আমি বাংলা বলবো—দেখবে?

বললাম—অলোকেশদা' তোমায় বাংলা শিখিয়েছে বুঝি?

সাহেব-বৌদি বললে—তোমাব নাম কী?

নাম শুনে বললে—ভেরি গুড, খুব ভালো—

বলে উঠলো। বললে—তোমরাও মিত্র আমরাও মিত্র—আমার নাম শ্রীমতী নোরা মিত্র—তারপর উঠে গিয়ে ইজি চেয়ারে হেলান দিলে।

বললে—আমার পাশে তোমার চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে এসো তো ভাই—

বললাম—আমাকে চকোলেট দেবে না সাহেব-বৌদি—আমার সেজদাকে দিয়েছ ?

সাহেব-বৌদি বললে—চকোলেট তো সব ফুরিয়ে গেছে ভাই। নিউ মার্কেট থেকে আরো চকোলেট নিয়ে আসবো—কাল এসো—

তারপর সাহেব-বৌদি বললে—আমি তো চকোলেট দেব আর তুমি আমায় কী দেবে শুনি ?

অনেক কাছে ঘেঁষে বসেছি। সাহেব-বৌদির গা থেকে একরকম চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছে। ভারি মিষ্টি গন্ধ। চকোলেটের চেয়েও মিষ্টি। হাতের চামড়াটা কী ফরসা। একটা ফ্রক পরেছে এখন। হাঁটু পর্যন্ত ঝুল। সেজদিও ফ্রক পরে কিন্তু এত ভালো দেখায় না তাকে।

সাহেব-বৌদি বললে—কী দেখছিস্ রে অমন করে ?

লজ্জায় পড়ে গেলাম। চোখ সরিয়ে নিলাম।

সাহেব-বৌদি আবার বললে—কী দেখছিস্ বল না—

বললাম—সব মেম-সাহেবরা তোমার মতন সুন্দর বুঝি সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি খুব হাসতে লাগল কথা শুনে।

বললে—কটা মেম-সাহেব দেখেছিস্ রে তুই ?

বললাম—একটাও না, শুধু তোমাকে দেখেছি—সবাই এই রকম ফ্রক পরে ?

সাহেব-বৌদি আরো হাসতে লাগল। বললে—ফ্রক পরলে বুঝি আমাকে ভালো দেখায় ?

বললাম—তুমি মার মতন শাড়ি পোরো না সাহেব-বৌদি, কেবল ফ্রক পোরো—

সাহেব-বৌদি বললে—বা রে, অলক যে শাড়ি পরতে বলে—বলে এদেশের মেয়েরা বড় হলে ফ্রক পরে না—

বললাম—শাড়ি পরলে মার মতন বিচ্ছিরি দেখাবে কিন্তু—

সাহেব-বৌদি বললে—তোর মাকে বুঝি বিচ্ছিরি দেখায় ?

বললাম—মা তো তোমার মতন ফরসা নয়, খালি একটু একটু ফরসা—

সাহেব-বৌদি বললে—মাকে কি অমন কথা বলতে আছে, ছিঃ—তারপর বললে—এই দেখ্, আমার মার ছবি দেখ্বি—

বলে উঠে টেবিল থেকে তুখানা ফটো দেখালে। বললে—এই দেখ্ আমার বাবা-মার ফটো—আমি যখন অলককে বিয়ে করি, বাবা রেগে গিয়েছিল—আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ তো ইণ্ডিয়ান বিয়ে করেনি কিন্তু আমার মা আমাকে চুমু খেয়ে খুব আদর করেছিল—আমি ইণ্ডিয়াতে চলে আসবার সময়ে খুব কেঁদেছিল ভাই, মা আমাকে খুব ভালবাসতো কিনা—

বললাম—মা'র জন্যে তোমার মন কেমন করে না সাহেব-বৌদি !

সাহেব-বৌদি বললে—করলে আর কী হবে, অলক বললে ওর বাবা-মা ইণ্ডিয়াতে ফিরে যাবার জন্যে বার বার চিঠি লিখছে, অলক আর কতদিন থাকবে, ওকে টাকা পাঠাবে কে ?

বললাম—অলোকেশদা' বঝি তোমাকে খুব ভালবাসতো ?

সাহেব বৌদি বললে—খুব, আমিও ভালবাসতুম খুব অলককে—অলক তুষ্টু ছিল কিনা—

বললাম—তুষ্টু ছেলেরা বুঝি ভাল সাহেব-বৌদি ? তুষ্টুমি করি বলে মা যে আমাকে খুব বকে—

সাহেব-বৌদি বললে—তুষ্টু ছেলেদের আমার খুব ভাল লাগে—

বললাম—আমি খুব তুষ্টুমি করি বলেই তো মা আমাকে 'তুষ্টু' বলে ডাকে—তা হলে আমাকেও তুমি ভালোবাসবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—তাহলে আমি এমনি করে আদর করবো তোকে, এই দেখ্—

বলে আমায় টেনে নিয়ে সাহেব-বৌদি গালে লম্বা করে চুমু খেলে ! কী চমৎকার সেদিন লাগলো। সাহেব-বৌদির ঠোঁটটা খুব

নরম। লাল লাল ঠোঁট। পাশের আয়নাতে দেখলাম আমার গালে সাহেব-বৌদির ঠোঁটের রঙের ছাপ লেগে গেছে।

মনে আছে সকালবেলা কোর্টে যাবার আগে অলোকেশদা' রোজ সাহেব-বৌদিকে চুমু খেত। আমি সামনে থাকলেও লজ্জা করতো না।

অলোকেশদা' বলতো—ও ছোট্ট ছেলে, ও কিছু বোঝে না—

সেজ-জ্যাঠাইমা মারা যাবার পর সেই অলোকেশদা' অশৌচ নিলে। গলায় কাছা, খালি পা, হাতে আসন। বিলেত ফেরত বলে কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হলো না কিন্তু। বড়-জ্যাঠামশাই, রাঙা কাকা, বাবা সবাই সত্যি অবাক্ হয়ে গেল।

বাড়ির পুরুত মশাই বললেন—মেম বিয়ে করলে কী হবে, বাবাজীর দিব্যি দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে ভায়া, পাঁচশো টাকা শুধু ব্রাহ্মণ বিদায়ে খরচ করেছে—

ধন্য ধন্য পড়ে গেল সমাজে।

তবু কেউ-কেউ বললে—তা হোক ঠাকুরমশাই, আপনি বাড়ি গিয়ে কাপড় কেচে ফেলুন—ম্লেচ্ছের ছোঁয়া, ও তিনপুরুষ গেলেও কাটে না—

ঠাকুরমশাই বললেন—তা কাচবো বৈকি—বাড়ি গিয়েই কাপড় কেচে ফেলবো—

ঠাকুরমশাই আরো বললেন—সাধে কি হাত পেতে দক্ষিণে নিয়েছি ভায়া—আগে কাঁচা গোবর খাইয়ে মেম-সাহেবকে জাতে তুলেছি তারপর পা ছুঁতে দিয়েছি—

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—তুমি নাকি কাঁচা গোবর খেয়েছ সাহেব-বৌদি?

সাহেব-বৌদি বললে—কেন রে? কে বললে তোকে?

বললাম, রাঙা-কাকীমা!

সাহেব-বৌদি হাসতে হাসতে বললে—তা খেলে কী হয়েছে,

গোবর খেলে যদি কেউ ছুঁতে দেয় খাবো—আমাকে কেউ যে ছোঁয় না মেম-সাহেব বলে—

তারপর খানিক থেমে বললে, হ্যাঁরে, তুই এখান থেকে গিয়ে কাপড়-জামা কেচে ফেলিস্ তো ?

বললাম, কেন, কাপড়-জামা কাচবো কেন ?

—তোর মা তোকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় ?

আমি বললাম, মা তো জানে না তোমার এখানে আসি, আমি পার্কে যাবার নাম করে তোমার এখানে চলে আসি—

সাহেব-বৌদি জিজ্ঞেস করলে—তোর মা যদি জানতে পারে ?

—জানতে পারবে কেন ?

তারপর সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে বললে—আমায় তোর এত ভালো লাগে কেন রে ? আমি চকোলেট দিই বলে ?

বললাম, চকোলেট তো সবাইকেই দাও—সবাই কি আমি, আমার মতন ?

সাহেব-বৌদি বললে, তা হলে তুই কেন আসিস্ ?

আমি চুপ করে রইলাম। কথা বলতে যেন লজ্জা হলো।

সাহেব-বৌদি বললে, যখন প্রথম ইণ্ডিয়াতে এলুম অলকের সঙ্গে, কী ভয় হয়েছিল জানিস্—

বললাম, কী ?

সাহেব-বৌদি বললে, এ-দেশ তো কখনও দেখিনি, ভিনসেণ্ট্ স্কোয়ারে সবাই ভয় দেখাতে লাগলো, ইণ্ডিয়ানরা বড় নোংরা, চারটে পাঁচটে বিয়ে করে, রাস্তায় রাস্তায় বাঘ-সিংহ ঘুরে বেড়ায় আর বৌকে ঝি-চাকরের মত খাটিয়ে নেয়।

তারপর বললে, অলক আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে সব, তবু ভয় আমার গেল না, তারপর জাহাজে একটা বাঙালী বৌ-এর সঙ্গে আলাপ হলো, সে আমায় শেখালে কী রকম করে প্রণাম করতে হয়, কী রকম করে শাশুড়ীর কথা শুনতে হয়—সব বৌটি শিখিয়ে দিয়ে বললে—

সেখানে কারো সামনে যেন সিগারেট খেও না, লোকে নিন্দে করবে।

তারপর বৌটি বললে, শাশুড়ীর পায়ের পাতার ধুলো নিয়ে মাথায় হাত ঠেকাবে, শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে বরের সঙ্গে কথা বলবে না, আর রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে তখন শুতে যাবে।

তার কাছেই তো হাত দিয়ে খেতে শিখলাম, শুক্তনি, ডাল, চচ্চড়ি রাঁধতে শিখলাম, ভারি ভালো মেয়েটি, আমাকে সব শেখালে।

তারপর কপালে একটা সিঁদুরেব টিপ দিয়ে বললে, কিন্তু এখানে এসে দেখলুম, সব উল্টো।

—উল্টো কেন ?

—উল্টো নয় ? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে দেখলাম সবাই পা সরিয়ে নেয়, ছুঁলে কাপড় কেচে ফেলে, আমার হাতের রান্না কেউ খায় না, বাড়িতে আমার জন্যে ঠাকুর থাকে না, চাকর থাকে না। হিন্দুরা কেউ কাজ করতে চায় না বাড়িতে !

সাহেব-বৌদি বললে, তাই তো যেদিন রান্নার লোক পালিয়ে যায়, হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সাহেব-বৌদি, তুমি তো গরু খাও ?

—গরু ?

সাহেব-বৌদি যেন প্রশ্ন শুনে হতবাক্ হয়ে গেল।

বললে, কেউ তোকে জিজ্ঞেস কবতে বলেছে বুঝি ?

বললাম, তুমি খাও কিনা তাই বলো না ?

—কে জিজ্ঞেস করেছে বল তো ! তোর মা ?

বললাম, গরু তো ভগবতী, গরু খাওয়া কি ভালো, তুমি বলো ?

সাহেব-বৌদির চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো যেন।

বললাম, গরু তুমি খেও না সাহেব-বৌদি, দাদা বলে—যারা গরু খায় তাদের পাপ হয়।

সাহেব-বৌদি বললে, না হয় আমার পাপই হলো, তাতে তো আমিই কষ্ট পাবো, তোর কী ?

কী জানি কেমন হলো, বললাম, তোমার কষ্ট হলে যে আমারও কষ্ট হবে তাহলে।

সাহেব-বৌদি হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে দুগালে চুমু খেয়ে বললে, ওরে দুষ্টু ছেলে, আচ্ছা আমি খাবো না গরু, হলো তো ?

তারপর বললে, আমি তো গোবর খেয়েছি, তাতেও হয়নি ?

এর পর কী জানি কেন আরো নেশা বেড়ে গেল। সাহেব-বৌদিকে রোজ একবার করে না দেখলে যেন ঘুম হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠে সাহেব বৌদির কথা মনে পড়ে। পড়তে বসে খালি সাহেব-বৌদির কথা ভাবি।

স্বপ্নেও সাহেব বৌদিকে দেখি। সাহেব-বৌদি ভালো করে আদর না করলে কান্না পায়। কয়েক বছরের জন্যে আমার নিজের খেলা ভুলে গেলুম। আমার বন্ধু-বান্ধবদের ভুলে গেলুম।

আগে খেলবার জন্যে কতদিন কত ছেলের বাড়ি গিয়ে খোশামোদ করেছি। তাদের বাপ মা কত বকেছে। বলেছে, যা, যা, বাড়ি যা, দুপুরবেলা খেলা কী রে ? লেখাপড়া নেই ? মা তোর কিছু বলে না ?

ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এসেছি। আবার হয়ত আর একজনের বাড়ি গিয়ে ডেকেছি। হয়ত সেখানেও তাড়া খেয়ে চলে এসেছি নিজেদের বাড়ি। তারপর দুপুরবেলা একলা একলা ছাতে গিয়ে মাটি ভিজিয়ে কাদা করে তাই দিয়ে ঠাকুর-দেবতা গড়ে পুজো করেছি নিজের মনে। কেউ আমার সঙ্গে খেলে না বলে কত দুঃখ পেয়েছি। রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে কতদিন বন্ধুরা ঝগড়া হওয়াতে মেরে পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছে। বাড়িতে এসে কাঁদিনি—পাছে বাড়ির কেউ জানতে পারে।

যেখানে গেছি সেখানেই এই রকম। বিলাসপুরে, জব্বলপুরে, কলকাতায়—সর্বত্রই। সবাই আমাকে একলা করে ছেড়ে দিয়েছে।

নিজের মনে তাই কখনও কাদা দিয়ে ঠাকুর-দেবতা গড়েছি, ছবি এঁকেছি লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে। আর যখন কেউ কোথাও থাকতো না, তখন রেকর্ডের গান গেয়েছি চুপি চুপি।

মা শুনতে পেলে বলতো—লেখা-পড়া নেই ছেলের, কেবল গান—গান গাওয়া হচ্ছে—

মাস্টার এসে সন্ধ্যেবেলা পড়া ধরতো। কিচ্ছু পারতুম না।

মাস্টার বলতো, এর কিছু হবে না—বাড়িতে একটুও পড়ে না—

মা বলতো, এই ছেলেটারই কিছু হলো না—হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়·· আমার যেমন কপাল—

চারিদিকের এই অভিযোগ আর অত্যাচারের মধ্যে যখন কোথাও কোনও সান্ত্বনার আভাস নেই, সেই সময়েই এল সাহেব-বৌদি আমার জীবনে। সাহেব-বৌদিও ঠিক আমার মত একলা। অলোকেশদা' হাইকোর্টে চলে যায় সকালে, তারপর একেবারে নিরিবিলি। তখন বিশেষ কোনও কাজ থাকে না সাহেব-বৌদির। প্রথম প্রথম পাড়ার বৌ-ঝিদের একটু কৌতূহল ছিল। কেমন করে গাউন পরে, কেমন করে শাড়ি পরে, কেমন করে হাত দিয়ে খায়, কেমন করে কথা বলে।

বড়-জ্যাঠাইমা এসে বলতো, কেমন করে চামচে দিয়ে খায় তোমাদের দেশে—দেখাও তো ভাই—

খাওয়া দেখে অবাক্ হয়ে যেত।

বলতো, ওমা, বাঁ হাতটা যে সক্‌ড়ি হয়ে গেল—তার বেলায়? এবার ওই সক্‌ড়ি হাত নিয়েই হেঁসেলের সব ছোঁয়া ন্যাপা করবে তো? কী ঘেন্না মা· কী ঘেন্না—

রাঙা-কাকীমা হয়ত জিজ্ঞেস করতো হ্যাঁ দিদি, কচি খুকিদের মত ফ্রক পরতে তোমার লজ্জা করত না?

সাহেব-বৌদি বলত, লজ্জা করবে কেন? সবাই তো পরে সেখানে।

—তা কত বয়েস পর্যন্ত ফ্রক পরে?

—সব বয়সেই পরে, রাস্তাতেও পরে বেরোয়··

রাঙা-কাকীমা লজ্জায়-ঘেন্নায় রাঙা হয়ে উঠে খিলখিল করে হাসতো—তা বলে সোমত্থ মেয়েরাও পরবে? বুড়ো ধাড়ি মেয়েরা ওই নিয়ে রাস্তায় বেরোয় কী করে মা আমাদের বলে এগারো হাত শাড়িতেও লজ্জা ঢেকে উঠতে পারি না—মেলেচ্ছদের দেশের সবই মেলেচ্ছ কাণ্ড···

তবু দেখতাম সাহেব-বৌদির মুখে কোনও রাগ নেই। কোনও কথা গায়ে মাখতো না। সকলের কথারই উত্তর দিত।

কিন্তু রাগ হয়ে যেত আমার।

সবাই চলে গেলে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তো। বলতাম—তুমি কেন ওদের সঙ্গে কথা বল সাহেব বৌদি? ওদের সঙ্গে তুমি আড়ি করে দিতে পারো না?

সাহেব-বৌদি আমার চোখ মুছে দিত রুমাল দিয়ে।

বলতো, বলুক গে, আমার তো ওতে কোনও ক্ষতি হয় না—

বলতাম, তোমাকে ওরা অমন করে বলে কেন?

সাহেব-বৌদি বলতো, বললে আমার আর কী—আমি তো ওদের কাছে কত শিখতে পারি—

তারপর বললে, ওদের কাছেই তো আমি গোবর দিয়ে ঘর নিকোতে শিখেছি, কুলের অম্বল রান্না করতে শিখেছি—খেয়ে এঁটো হাত ধুতে শিখেছি, আলতা পরতে শিখেছি—ওরা না হলে কে আমায় শেখাতো বল?

বললাম, ও সব আমিও শেখাতে পারি—

সাহেব-বৌদি বললে, তুই যা পারিস্ বোঝা গেছে, তোর যখন বয়েস হবে তখন দেখবো তোর কত ক্ষমতা·

বললাম, তুমি অলোকেশদা'কে বলে দাও না কেন?

সাহেব-বৌদি বলতো, সে-মানুষ সারাদিন অফিসে কাজ করে আসবে, তখন যদি এ-সব বলি খারাপ লাগবে না শুনতে?

তারপর বলতো, এমনিতেই তো মেমসাহেব বিয়ে করেছে বলে

অলককে কেউ দেখতে পারে না, তার ওপর এ-নিয়ে যদি বলাবলি করি তখন যে আর কেউ আসবে না আমার বাড়িতে—

বলতাম, কিন্তু তুমি তবে কেন বিয়ে করলে আলোকেশদা'কে, এ-বিয়ে না করলে তো তোমার এ-তুর্গতি হ'ত না—তুমি কত বড়লোকের মেয়ে, কত বড়লোকের সঙ্গে বিলেতে তোমার বিয়ে হোত—

আমার কথা শুনতে শুনতে সাহেব-বৌদি যেন হঠাৎ উদাস হয়ে যেত। হঠাৎ যেন সব মনে পড়তো আবার। আমি দেখতাম—সাহেব-বৌদি খাটের ওপর শুয়ে জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। বোধহয় সাহেব-বৌদির চোখের সামনে ভেসে উঠতো পাইন আর পপলারের ঝাড়। ঠাণ্ডা বরফের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী রোদের পিছলে যাওয়া শ্লেজগাড়ি আর নাইটিঙ্গেল। ভিনসেণ্ট স্কোয়ারের টালিতে ছাওয়া বাড়িগুলোর মাথায় সাদা সাদা পেঁজা তুলোর রাশ। বার্চ আর ওক্ গাছের পাতার শির্ শিব্ শব্দ। আর ভোরবেলা ডাইনিং হলের ব্রেকফাস্টের গন্ধে ঘুম ভেঙে যাওয়া। ব্রেকফাষ্টের টেবিলে ফুলের ঝাড়। আর তারপর সামনের লন থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত লম্বা ফুলগাছের সারি। সেখানে বেড়ানো।

নিজে বিলেত কখনও যাইনি। যাবার ইচ্ছেও হয়নি কখনও। কিন্তু সাহেব-বৌদির চোখের * দিকে চেয়ে বিলেতের ভিনসেণ্ট স্কোয়ারের একটা মন-গড়া ছবি এঁকে নিতুম।

জিজ্ঞেস করতাম, তোমার বাবা খুব বড়লোক ছিল, না সাহেব-বৌদি ?

এক বিছানায়, সাহেব-বৌদির পাশে শুয়ে শুয়ে তুজনে অনেক অফুরন্ত কথা বলতুম।

সাহেব-বৌদি শুনতে না পেলে আবার জিজ্ঞেস করতাম, তোমার বাবা কি খুব বড়লোক ছিল সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি অন্যমনস্ক হয়ে বলতো—খুব।

জিজ্ঞেস করতাম, মটর গাড়ি ছিল তোমাদের ?

সাহেব-বৌদি বলত, হ্যাঁ।

জিজ্ঞেস করতাম, ক'টা ?

সাহেব-বৌদি বলতো—ছটো, একটা পুরোন আর একটা নতুন।

—তুমি গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যেতে ?

—হ্যাঁ।

জিজ্ঞেস করতাম, কোথায় বেড়াতে যেতে ?

সাহেব-বৌদি বলতো, কত জায়গায় বেড়াতে যেতুম।

তবু জিজ্ঞেস করতাম, কোন্ কোন্ জায়গায় যেতে ?

সাহেব-বৌদি কত জায়গার নাম করতো। সুন্দর সুন্দর নাম সব। আজ সে-সব নাম মনে নেই। কিন্তু নামগুলো কানে গেলেই মনে হতো যেন অনেক সুন্দর জায়গা সে-সব। আমাদের পাড়ার চেয়ে অনেক সুন্দর। এমন ধুলো বালি, ধোঁয়া নেই সেখানে। সব ফরসা ফরসা চেহারার ছেলে-মেয়ে! ফরসা জামা-ফ্রক পরা। চারিদিকে কেবল ফুল আর পাখী, কেবল খেলা আর গান। কেউ কাউকে বকে না সেখানে, কেউ কাউকে মারে না, কেউ কাউকে কাঁদায় না। ইস্কুলের মাস্টারেরা সেখানে ছেলেদের খুব ভালবাসে। অঙ্ক ভুল হয়েছে বলে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয় না।

বললাম, ছপুরবেলা কী করতে সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি বলতো - স্কুলে যেতুম।

জিজ্ঞেস করতাম, তুমি ইস্কুলে অঙ্ক পারতে ?

সাহেব-বৌদি বলতো, হ্যাঁ।

—যেদিন অঙ্ক পারতে না ?

সাহেব-বৌদি আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলতো। বলতো, আমি রোজ অঙ্ক পারতুম, আমার একদিনও ভুল হতো না।

জিজ্ঞেস করতাম, তোমার বাড়ির মাস্টার ছিল ?

সাহেব-বৌদি বলতো, হ্যাঁ।

জিজ্ঞেস করতাম—সাহেব মাস্টার ?

তখন ছোট ছিলাম। অদ্ভুত ছিল সব প্রশ্ন। কিন্তু অনবরত প্রশ্ন করলেও বিরক্ত হতো না সাহেব-বৌদি। বলতো—কত আরামে যে সে-সব দিন কেটেছে, তোরা কল্পনাও করতে পারবি না, আমার নিজেরই ছিল একটা আয়া, আমাকে নিয়ে খেলতো, আমাকে জামা-জুতো পরিয়ে দিত, ঘুম পাড়িয়ে দিত, সাত জোড়া জুতো ছিল আমার, এই বাড়িটার চার-ডবল বাড়ি ছিল আমাদের, সামনে বিরাট লন আর পেছনে ফুলের ফলের বাগান।

অত সুখের জীবন ছেড়ে কেন যে সাহেব-বৌদি কষ্ট করতে অলোকেশদা'কে বিয়ে করলে কে জানে।

বলতাম, আচ্ছা, অলোকেশদা'কে বিয়ে না করলে তো তোমার এই ভোগান্তি হতো না।

সাহেব-বৌদি বলতো, কই, আমার তো কোনও কষ্ট নেই, কোথায় কষ্ট দেখলি আমার তুই?

বলতাম, বা রে, কত বড়লোকের বাড়ির মেয়ে তুমি, কত আদরে মানুষ, আর এখানে এসে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? নিজের হাতে তোমায় যে কাজ করতে হয়।

সাহেব-বৌদি বললে, তা হোক, অলক তো আমায় ভালবাসে।

আমি বললাম, আমিও কিন্তু তোমায় খুব ভালবাসি সাহেব-বৌদি।

সাহেব-বৌদি কথাটা শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, তাই জন্যেই তো তোর নাম রেখেছি দুষ্টুমণি।

কিন্তু অলোকেশদা' কোর্ট থেকে আসবার আগে সাহেব-বৌদি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তো। বাথরুম থেকে গা ধুয়ে এসে নতুন সিল্কের শাড়ি পরতো। মুখে পাওডার স্নো মেখে তৈরি হয়ে থাকতো।

আমাকে বলতো, তোর কড়ে আঙুল দিয়ে আমার কপালে একটা টিপ লাগিয়ে দে তো—ঠিক দুই ভুরুর মাঝখানে।

সাহেব-বৌদি বাঙালীদের মত মাথার চুল লম্বা করেছিল। নিজে

খোঁপা ভালো করে বাঁধতে জানতো না। এক একদিন আমি বলতাম, দাও সাহেব-বৌদি, আমি তোমার চুল বেঁধে দিই।

সাহেব-বৌদি একটু ভেবে বলতো, পারবি তুই? বিনুনি করতে?

বললাম, রাঙা-কাকীমা যেমন করে মা'র খোঁপা বেঁধে দেয় তেমনি করে বেঁধে দেব দেখ—

কিন্তু খোঁপা বাঁধা অত সহজ নয়। তবু সাহেব-বৌদির মাথার রেশমের মত চুলগুলো নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করতাম। সাহেব-বৌদি অনেকক্ষণ পেছন করে বসে থেকে থেকে এক সময়ে বলতো, হলো তোর?

বলতাম, আর একটু বাকি।

কিন্তু সাহেব-বৌদিব সেই বেশমেব মত একগোছা চুল নিয়ে কিছুতেই আর কায়দা করতে পাবতাম না। যতবার বিনুনি নিয়ে ফাঁস বাঁধতে যাই ততবাবই ফস্‌কে যায়। কিন্তু তবু যেন ছাড়তে ইচ্ছে করতো না। সাহেব-বৌদির চুলগুলো নিয়ে যেন অকারণে খেলা করতাম।

সাহেব বৌদি আবার অধৈর্য হয়ে বলতো, হলো রে তোর?

বলতাম, দাঁড়াও সাহেব-বৌদি, আর একটু বাকি।

তাবপর আবার চলতো আমার সেই কেশ-বিলাস। সাহেব-বৌদির চুল নিয়ে আমি মুঠো মুঠো কবে ধরতুম। চুলগুলো ফুলের মত ফেঁপে উঠতো। আবার মুঠো খুলতাম, সঙ্গে সঙ্গে রেশমের মত নরম চুলগুলো আবার নেতিয়ে পড়তো। কত বড় লম্বা সাহেব-বৌদির চুল। মার চেয়েও সাহেব বৌদির চুল ছিল আরো লম্বা। রাঙা-কাকীমার চেয়েও লম্বা। ঝুলিয়ে দিলে পিঠ ছাড়িয়ে অনেক নিচে পর্যন্ত লুটিয়ে পড়তো—একেবারে সাহেব-বৌদির ফরসা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত।

সাহেব-বৌদি বলতো, দূর, ও থাক, তুই চুল বাঁধতে জানিস্ না, আমার ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল।

কিন্তু আলতা পরাতে আমি খুব পটু ছিলাম।

মাটিতে বসা অভ্যেস ছিল না সাহেব-বৌদির। মাটিতে অনেকক্ষণ বসে থাকলে বড় কষ্ট হতো সাহেব-বৌদির। সাহেব-বৌদি তাই চেয়ারে বসে শাড়িটা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করে তুলে ধরতো, আর আমি পায়ের কাছে বসে পা দুটো তুলে নিতাম নিজের কোলে। তারপব তুলি দিয়ে সেই মোমের মত ফরসা পায়ের পাতার ধারে ধারে আলতা লাগিয়ে দিতাম।

সাহেব-বৌদি মাছে মাঝে পা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করতো।

বলতাম—ওকি, অমন করছো কেন, ধেবড়ে যাবে যে।

সাহেব-বৌদি খিলখিল করে হেসে উঠতো!

বলতো, বড় সুড়সুড়ি লাগছে।

আমি রেগে যেতাম, বলতাম, ও বকম করলে আমি তোমায় আলতা পরাতে পারবো না।

সাহেব-বৌদি বলতো—আচ্ছা, আচ্ছা, আর পা নাড়াবো না, বলে স্থির হবার চেষ্টা করতো কিন্তু তবু বাববার নড়ে যেত পায়ের পাতা! কী চমৎকার যে সে পায়েব চেহারা সাহেব-বৌদির। পা দুটো নিয়ে কতবার যে আলতা পরাবাব ছল করে টিপে দিতুম। মনে হতো আমার আলতা পরানো যেন আর শেষ না হয় কখনও।

যেন এমনি করে পা-জোড়া কোলে তুলে অনন্তকাল ধরে সাহেব-বৌদিকে আলতা পরাই।

অলোকেশদা' কোর্ট থেকে ফিরে বলতো—তোমায় আলতা পরিয়ে দিলে কে?

সাহেব-বৌদি হাসতে হাসতে বললে—ওই দুষ্টু ঠাকুর-পো—

আমার তখন ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে শরীর। অলোকেশদা' যদি রেগে যায়। যদি আসতে বারণ করে দেয় এখানে।

সাহেব-বৌদি বললে—আমার এই টিপও পরিয়ে দিয়েছে ও, জানো—

এর পরে আর আমার থাকা হতো না ; এর পর অলোকেশদা' সাহেব-বৌদিকে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যেত। আমি আস্তে আস্তে বাড়ি চলে আসতাম। বাড়ি এসে সাহেব-বৌদির কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়তাম তখন।

সাহেব-বৌদি বলতো—একদিন তুই যাবি আমাদের সঙ্গে ?

বলতাম—কোথায় ?

—আমরা যেখানে যাই—একদিন তোকে নিয়ে যাবো, আইসক্রীম খাওয়াবো তোকে, তোর মাকে বলে আসিস্—

বললাম—মা তোমার সঙ্গে যেতে দেবে না—তোমাকে ছুঁলে কাপড় কেচে ফেলতে বলে—

কিন্তু একদিন আর লোভ সামলাতে পারলাম না। সাহেব-বৌদি, অলোকেশদা' তখন সেজেগুজে তৈরি। সাহেব-বৌদি বললে—যাবি তুই আমাদের সঙ্গে ?

বললাম—যাবো।

তারপর সামনে বসে অলোকেশদা' গাড়ি চালাতে লাগলো, তার পাশে বসলো সাহেব-বৌদি। আর আমি পেছনে। কিন্তু আমার ভালো লাগলো না। সাহেব-বৌদির পাশে না বসলে কি ভালো লাগে ! আমার সঙ্গে কথাই বললে না সাহেব-বৌদি। সারাক্ষণ কেবল অলোকেশদা'ই কথা বলতে লাগলো। দুজনে ঘেঁষাঘেষি বসেছে। কত কথা হচ্ছে। অলোকেশদা' বাঙলা শেখাবার জন্যে বাঙলা কথাই বলতো। সাহেব-বৌদিও বাঙলা কথা বলছে। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ কথা বলে না।

পরদিন থেকে আমি আর সঙ্গে গেলুম না। বাড়িতে বসে বসে সাহেব-বৌদির ওপর অভিমান করে চোখ-মুখ ভারি করে ফেললুম।

মানুষের বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনের বয়েসও বাড়ে। একদিন যে সাহেব-বৌদিকে একান্ত নিজের করে পেতে চেয়েছিলাম,

অলোকেশদা' ভাগ বসাতো বলে মন খারাপ করতাম, সেদিনের কথা মনে পড়লে হাসি পেতে লাগলো ! ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে কতদিন মনে হয়েছে সাহেব-বৌদির বাড়ি গিয়ে দেখে আসি কেমন আছে আজ। তখন নিজের মনে আস্তে আস্তে অপরাধবোধ জাগতে শুরু করেছে। মনে বুঝতে শিখেছি—আমি সাহেব-বৌদির পর। সাহেব-বৌদিও আমার পব। ঠিক আগেকার মত এক বিছানায় শুয়ে সাহেব-বৌদির কাছে আদর পাওয়ার বয়েস আব নেই, কিম্বা সাহেব-বৌদিব পা-জোড়া নিয়ে আলতা পরানো আর সঙ্গত নয়—শোভনও নয়।

কিন্তু তবু লোভ দমন করতে পারি না।

হঠাৎ কোনও দিন গিয়ে পড়লে সাহেব-বৌদি অবাক হয়ে যায়।

বলে—এতদিন কোথায় ছিলি ?

তারপর নিজের শোবার ঘবে বসিয়ে চা খাওয়ায়। আগের দিনের রাত্রে হোটেল থেকে আনা কেক পেস্ট্রি খেতে দেয়। সাহেব-বৌদি যেন আরো বাঙালী হয়েছে আগের চেয়ে। শাড়ির আচলে চাবির গোছা বেঁধেছে। ভিজে চুল পিঠের ওপব ছড়ানো। তারই মধ্যে আবার এলোচুলে থাকতে নেই বলে কয়েকটা চুল নিয়ে একটা গেরো দিয়েছে। কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়েছে, পায়ে আলতা পরেছে।

বললাম—তোমায় আজকাল কে আলতা পরিয়ে দেয় সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি হাসতে হাসতে বললে—তুই বুঝি ভেবেছিস্ তুই ছাড়া আর আমার আলতা পরাবার কেউ লোক নেই ?

বললাম—আমি তো এখন বড় হয়ে গেছি, এখন কি আর তুমিই আমার কাছে আলতা পরবে ?

—ওমা, কই কত বড় হয়েছিস্ দেখি—?

বলে হাসতে হাসতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বললে—দাঁড়াতো, মেপে দেখি কত বড় হয়েছিস্ ?

সাহেব-বৌদির বুক ঘেঁষে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

সাহেব-বৌদি বললে—আরো সরে আয়—

তারপর আমার ওপর হাত দিয়ে মেপে নিয়ে বললে—এই দেখ্ তুই এখনও আমার বুক পর্যন্ত হোস্‌নি—

কিন্তু আমার তখন যেন গায়ে জ্বর আসছে। আমার চোখ-মুখ নাক-কান গরম হয়ে জ্বালা করছে। আমি মুখ নিচু করে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসলুম।

সাহেব-বৌদি হঠাৎ আবার কাছে এসে বললে—কীরে, অত হাঁপাচ্ছিস্ কেন, তেষ্টা পেয়েছে নাকি একটু জল খাবি ?

সাহেব-বৌদি জল নিয়ে এল।

বললে—কালকে অলকের কী হয়েছিল জানিস্ ?

বললাম—কী ?

সাহেব-বৌদি বললে—কালকে একটা এ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেছি আমরা—

তারপর বললে—এ্যাক্সিডেন্টের বাঙালা কী রে ?

বললাম—দুর্ঘটনা।

সাহেব-বৌদি বললে—দুর্ঘটনা ! তার মানে ?

বললাম—তার মানে এ্যাক্সিডেন্ট—

দুজনেই হেসে উঠলাম।

সাহেব-বৌদি বললে—দূর, এ্যাক্সিডেন্ট মানে দুর্ঘটনা নয়, এই যে তুই হঠাৎ আমার ঘরে দুপুরবেলা এলি—আমি তোকে মেপে দেখলুম —তোর জল তেষ্টা পেয়ে গেল, এটাও তো এ্যাক্সিডেন্ট—

বললাম—এটা কেন এ্যাক্সিডেন্ট হতে যাবে, তা যদি হয় তবে ওর বাঙলা হয় না—

সাহেব-বৌদি—তা কালকের এ্যাক্সিডেন্টটা কিন্তু দুর্ঘটনা ভাই—গাড়ি চালাচ্ছে অলক আর সেই অবস্থায় আমি ওকে চুমু খেতে গিয়েছিলাম—আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে একটা গাড়ি এসে গেছে—

বললাম—সর্বনাশ, তারপর ?

সামান্য সব ঘটনার সমষ্টি নিয়েই মানুষের জীবন। অনেকবার ভেবেছি মানুষ বিয়ে করে কেন। বেশ একলা কাটিয়ে দিলেই তো আরাম। কোনও দায় নেই ! দায়িত্ব নেই ! অলোকেশদা' যদি বিয়ে না করতো কার কী ক্ষতি হ'ত। সেজ-জ্যাঠাইমা অমন অকালে মারা যেত না। সেজ-জ্যাঠামশাই আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতো। কোথাকার কোন্ সাহেব-বৌদি, কোন দেশের মেয়ে, কোথায় মানুষ হয়েছিল, সেখানেই জীবন কাটিয়ে দিত। কোন সাত সাগর তের-নদীর পার থেকে এদেশে এসে সমস্যার সৃষ্টি করতো না ! আর সমস্যা কি শুধু সাহেব-বৌদির আর অলোকেশদা'র ! সমস্যা তো আমারও। আমিও দেখতে পেতাম না মেয়েদের জীবনের আর একটা দিক।

কত রকম চরিত্রের মেয়েমানুষ দেখেছি। কিন্তু সকলেই যেন আলাদা। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। এক নিয়মে কি সবাইকে বাঁধা যায়। এক ছাঁচে কি সবাইকে ঢালা যায়। যারা আমাকে চিঠি লিখে নিজের নিজের জীবনের সমস্যা জানায়, যারা দেখা করতে চায় তাদের জীবনের গল্প শোনাবে বলে, তাদের কেউ থাকে যাদবপুরে, কেউ বেলঘরিয়াতে, কেউ শিবপুরে। তাদের সবাই-ই তো আলাদা। বাইরে শুধু সবাই মেয়ে। শাড়িপরা গয়নাপরা চেহারা। আসলে ভেতরে সবাই মানুষ। সকলকেই শ্রদ্ধা করি। তাঁদের সকলকেই ভালবাসি। মনে মনে কামনা করি সবাই যেন সুখী হয়, সবাই যেন শান্তি পায়, সবাই যেন অন্তরের অন্তর্যামীকে একান্ত করে বলতে পারে—আমার কোনও অভাব নেই—কোনও অভিযোগও নেই—আমি সুখ পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি জীবনে—

আজ আমার ঘরের এককোণে বসে আমি লিখি আর অতীত জীবনের সব ঘটনার শুধু রোমন্থন করি। যাদের সঙ্গে জীবনের পথে চলতে চলতে সাক্ষাৎ হয়েছিল, কখনও বা ক্ষণকালের জন্যে, কখনও

বা দীর্ঘকাল, তাদের সবাইকে মনে মনে প্রণাম করি। বলি—তোমরা যে-যেখানে থাকো, সুখে থাকো—এর থেকে বড় প্রার্থনা আমার আর নেই—এর থেকে বড় কামনাও আমার আর নেই—

সেদিন সেই ছোটবেলায়ই সাহেব-বৌদি আর অলোকেশদা'র জীবনে যখন চরম দুর্ঘটনা এলো সেদিনও দুজনের মঙ্গল কামনাই করেছিলাম।

মনে আছে আমাদের ইস্কুলের গেটের কোণে দরোয়ানের ঘরের পাশে অশথ গাছতলায় একটা শিবলিঙ্গ ছিল। ইস্কুল থেকে ছুটির পর বেরিয়ে সিমেণ্ট বাঁধানো বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ প্রণাম করেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম—তুমি যদি সত্যি থাকো ঠাকুর, সাহেব-বৌদির মনে শান্তি দিও—তারপর বলেছিলাম—সাহেব-বৌদি হিন্দু নয় বলে তুমি কিছু মনে করো না ঠাকুর, সাহেব-বৌদি গরু খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, গোবর খেয়ে শুদ্ধ হয়েছে—সাহেব-বৌদির এখানে এদেশে আপন কেউ নেই এক অলোকেশদা' ছাড়া—তুমি ওকে শান্তি দাও ঠাকুর—

তাতেও শেষ পর্যন্ত কিছু হয়নি। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে একটা খৃস্টানদের গীর্জা আছে জানতাম, একদিন হেঁটে হেঁটে গিয়ে থামগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করলাম—সাহেব-বৌদির মনে শান্তি দাও ঠাকুর—সাহেব-বৌদির মঙ্গল করো—তোমার দেশের মেয়ে এদেশে বউ হয়ে এসে বড় কষ্ট পাচ্ছে ঠাকুর—তাকে আর কষ্ট দিও না।

ফেরবার পথে কালীঘাটে গিয়ে সওয়া পাঁচ আনার পুজো দিয়ে মাটির চ্যাপটা খুরিতে করে পেসাদ আর জবা ফুল নিয়ে এসে সাহেব-বৌদিকে দিলাম।

বললাম—এই ফুলগুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাও আর পেসাদটা খেয়ে নাও—

আরো সাবধান করে দিলাম—পেসাদ খেয়ে হাতটা ধুয়ে ফেল সাহেব-বৌদি—না হলে পাপ হয়—

সাহেব-বৌদি বললে—হিন্দু ঠাকুরের পেসাদ আমি খাবো ?

বললাম—তাতে কি হয়েছে—তুমি তো গোবর খেয়েছ—

তা অত প্রার্থনা, অত পুজো, অত মানত, তাতেও কিছু হলো না কিন্তু। আমি দিন-রাত প্রার্থনা করতাম যেন সাহেব-বৌদির কোনও অনিষ্ট না হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অলোকেশদা'র আপন খুড়তুতো ভাইরা মামলা মকদ্দমা করে ··

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

তার আগে অলোকেশদা'র অন্যান্য কথা বলি।

অলোকেশদা' ব্যারিস্টারি করতে হাইকোর্টে যেত সকালবেলা, তারপর আসতো ঠিক সন্ধ্যেবেলা। তখন আসতো এ্যাটর্নী আর মক্কেলরা। দিন দিন প্র্যাক্‌টিশ বেড়ে যেতে লাগল অলোকেশদা'র। খাবার ঘুমোবার সময় পায় না, রাত্রেও কাগজপত্র নিয়ে বসে। আর রবিবারেও হয়ত কোন কমিশনের কাজে মফঃস্বলে চলে যায় সাহেব-বৌদিকে একলা বাড়িতে ফেলে।

জিজ্ঞেস করতাম—অলোকেশদা' কোথায় সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি তখন সেজে-গুজে কপালে টিপ দিয়ে পায়ে আলতা পরে বসে আছে দালানে।

বললে—অলক গেছে মফঃস্বলে—

আগে মাঝে মাঝে দেখতাম বাড়ির সামনে দিয়ে সাহেব-বৌদির গাড়িটা সোঁ করে চলে গেল। এক সেকেণ্ডের জন্যে দেখা যেত অলোকেশদা' গাড়ি চালাচ্ছে স্টিয়ারিং ধরে, মুখে সিগারেট আর পাশে অল্প ঘোমটা দিয়ে সাহেব-বৌদি বসে আছে। যেত সন্ধ্যাবেলা আর কখনও কখনও ফিরতো অনেক রাত করে।

পরের দিন বলতাম—কাল কত রাতে ফিরলে তোমরা সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি অবাক্ হয়ে বলতো—ওমা, তুই দেখলি নাকি আমাদের ? কোথায় ছিলি তুই ?

বললাম—খাওয়া দাওয়া করলে কখন ?

সাহেব-বৌদি বললে—হোটেলে খেয়ে নিলাম—

তা মাসের মধ্যে অন্তত পনরো দিন সাহেব-বৌদিরা বাইরে হোটেলে খেয়ে আসতো—

বললাম—কী খেলে ?

হেসে ফেলতো সাহেব-বৌদি।

বলতো—গরু খাইনিরে, তোর ভয় নেই—এখন তো পুরোপুরি হিন্দু হয়ে গেছি রে তোর মত—এই দেখ না, বাড়িতে ভাত খেয়ে গোবর দিয়ে এঁটো পাড়ি, কাঁটা চামচে ছেড়ে দিয়ে হাতে ভাত খাই —আর খাবার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলি—

সত্যিই সাহেব-বৌদি মনে প্রাণে হিন্দু হবার চেষ্টা করেছে। কেমন করে আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রিয় হওয়া যায়—কী করলে তারা সাহেব-বৌদির সঙ্গে মেলামেশা করবে—এই-ই দিন রাত ভাবতো। তবু মন পেত না কারো।

আমি বলতাম—তোমার দরকার কী সাহেব-বৌদি ? না মিশলো বয়ে গেল—তুমি একলা গাড়ি নিয়ে অলোকেশদা'র সঙ্গে বেড়াবে—আর আমি তো আসিই—

সাহেব-বৌদি হাসতো।

বলতো—অলক তো পুরুষ মানুষ, সমস্ত দিন চব্বিশ ঘণ্টা কি আর বৌ-এর সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে কারো—

বলতাম—কিন্তু আমার তো চব্বিশ ঘণ্টা ছেড়ে আটচল্লিশ ঘণ্টাই তোমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে।

সাহেব-বৌদি হেসে ফেলতো।

বলতো—এখন করে, কিন্তু বড় হলে আর ইচ্ছে করবে না—

বলতাম—নিশ্চয় ভালো লাগবে তোমাকে—চিরকাল ভালো লাগবে—তুমি কোনও দিন পুরোন হবে না আমার কাছে—

সাহেব-বৌদি তবু হেসে বলতো—তোর বিয়ে হোক, বিয়ে হলে দেখবি বৌ-এর কাছে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে তোরও ভালো লাগবে না—

তারপর একটু থেমে সাহেব-বৌদি বলতো—অথচ এই অলকই সেখানে বিয়ে হবার আগে আমাকে বলতো—নোরা, তোমাকে ছেড়ে আমার এক মিনিটও ভালো লাগে না—তোমাকে এক ঘণ্টা না-দেখতে পেলে পাগল হয়ে যাই—

জিজ্ঞেস করতাম—আর তুমি?

—আমি!

সাহেব-বৌদি যেন হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হতে যেত। সাহেব-বৌদির চোখের দিকে চেয়ে দেখতাম—যেন অনেক দূরের কোন্ অদৃশ্যলোকে সে-চোখের দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে আছে। যেন কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে সাহেব-বৌদির ভাবনা!

বলতাম—কী ভাবছো সাহেব-বৌদি!

সাহেব-বৌদি বলতো—না, কিছু না, তুই কথা বল—

তবু বলতাম—কী ভাবছিলে তুমি বলো না সাহেব-বৌদি?

যেন সাহেব-বৌদির গোপন ভাবনার অংশ না পেলেও আমার মন খারাপ হয়ে যেত। যেন সাহেব-বৌদির ভাবনার ওপরেও আমার অনস্বীকার্য অধিকার আছে। সাহেব-বৌদির ভাবনা, স্বপ্ন, চিন্তা ভবিষ্যৎ সমস্তর সঙ্গে একদিন নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। আমার কল্পনা, আমার স্বপ্ন, আমার মানসের সঙ্গে অন্তত কিছুদিনের জন্যে অচ্ছেদ্যভাবে একাত্ম করে দিয়েছিলাম সাহেব-বৌদিকে। আমার নিজের স্বভাবই ছিল এই রকম। যখন যার কাছে থাকতাম, তাকেই মনে হতো আপনার। নিতান্ত স্বার্থপরের মত সে-ভালবাসা। তাতে কারো ভাগ বসানো চলবে না। তাই অলোকেশদা' সাহেব-বৌদিকে চুমু খেলেও আমার যেন কেমন অস্বস্তি হতো!

আজ অবশ্য বড় হয়েছি। আজ সে-সব কথা ভাবতে লজ্জাও হয় —হাসিও পায়। সেদিন ভাবতাম—কেন লোকে বিয়ে করে। দরকার কি বিয়ে করার। বেশতো কাটবে একলা। যার যাকে খুশী ভালোবাসবে। স্ত্রী ও পুরুষে মিশে চিরকালের জন্যে যে ছুই-এ মিলে এক হতে হয় একথা তখন জানতাম না। জানতাম না এক হাতে পুষ্পাঞ্জলি দিলে দেবতার পুজো হয় না। জানতাম না, নারায়ণ বা ব্রহ্মা প্রথমে আপন শবীবকে ছুখণ্ড করে স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন —বিয়ের পর আবার ছুই শবীব এক হয়ে যায়। সাহেবদের একত্ব লিরিক আর আমাদেব এ একত্ব ড্রামাটিক। নাটকে গান থাকে, গানে নাটক থাকে না। আমাদের বিয়ের সময় ববকে মন্ত্র পড়িয়ে কনেকে আকাশেব অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানোব বীতি আছে।

বলে—ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাঽহমস্মি—হে অরুন্ধতী, আমি যেন তোমার মত পতিতে লগ্ন হয়ে থাকি।

তাঁবপব বর কনেকে দেখে বলে—আকাশ ধ্রুব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্রুব, পর্বত সকল ধ্রুব—এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব।

আমাদের দেশে আমরা হিন্দুরা বলি—আমাদেব পতি-পত্নীর মধ্যে যদি কোথাও অমিল থাকে তো আজ হোক, কাল হোক—তা যেন অদৃশ্য হয়ে আবাব এক হতে পাবি। হে সর্বদোষহর অগ্নি, তুমি দেবলোকেব দোষ নষ্ট কর, তাই শরণার্থী হয়ে আমি তোমার আশ্রয় নিলাম, তুমি এই কন্যার পতি-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট করো। হে সর্বদোষহর সূর্য, তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করে থাকো, তাই শরণার্থী হয়ে আমি তোমার আশ্রয় নিলাম, তুমি এই কন্যার গৃহধর্ম-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট করো।

কিন্তু সাহেব-বৌদি যে-দেশের মেয়ে তারা বলে—আজ আমাদের প্রেম হয়েছে বটে কিন্তু কাল যদি আমাদের মধ্যে অপ্রেম হয় অমিল হয় তখন যেন দাম্পত্য-বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারি, আইনে যেন তার ব্যবস্থা থাকে।

আমরা সৃষ্টি এবং পালনের পক্ষপাতী আর সাহেব-বৌদিরা প্রলয়ের পক্ষপাতী। আমরা বর-কনের বিরোধ ঘুচিয়ে দাম্পত্য-গ্রন্থি এঁটে দিতে চাই আর সাহেব-বৌদিরা বর-কনের বিরোধ বাড়িয়ে দাম্পত্য-গ্রন্থি খুলে দিতে চায়।

এ-সব কথা এখনকার মত বড় হয়ে বোঝবার কথা।

তাই সেদিন যখন আবু পাহাড়ের হাওয়া-মহলে বসে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তা হলে সব তোমার মিথ্যে সাহেব-বৌদি?—তোমার সিঁদুর পরা, আলতা পরা, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা, তোমার হবিষ্যি করা, একাদশী করা—সব মিথ্যে?

সাহেব-বৌদি সলমা চুমকির পোষাকে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে ওড়না ভাসিয়ে দিয়েছিল। এমন করে কোনও মেম-সাহেবকে কখনও কাঁদতে দেখিনি। মেম-সাহেব কাঁদলে যে এত করুণ দেখায়, সাহেব-বৌদির সেই কান্না দেখবার আগে ত জানতুমও না।

সাহেব-বৌদি বললে—মিথ্যে নয় তুষ্টু ঠাকুরপো, এ এ্যাক্সিডেণ্ট।···

আমি আরো অবাক্ হয়ে গেলাম!

—এ্যাক্সিডেণ্ট!

মনে আছে সাহেব-বৌদি একদিন এ্যাক্সিডেণ্টের বাঙলা মানে জিজ্ঞেস করেছিল। ও-শব্দের বাঙলা তো হয় না। সেদিন তাই ও কথাটার মানে বলতে পারিনি। আজও কথাটা শুনে কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গেলাম।

সাহেব-বৌদি বললে—আমার মত এমন করে কেউ—কোনও মেম-সাহেব বাঙালী হতে পেরেছে? হিন্দুঘরের বউ হতে পেরেছে?

বললাম—তা আমি দেখিনি সাহেব-বৌদি।

—পারেনি রে পারেনি। ঘেন্নায় যখন বমি আসছে, তা চেপে রেখে এমন করে শাশুড়ীর ময়লা পায়ের ধুলো মাথার পরিষ্কার চুলে ছোঁয়াতে পারেনি।···কিন্তু কেন পারেনি জানিস্?

বলেছিলাম—না—

সাহেব-বৌদি বললে—এ-ও সেই এ্যাক্সিডেণ্ট।

বললাম—তার মানে ?

সাহেব-বৌদি বলেছিল—তবে শোন্—

বলে একটু থেমে আবার বললে—আমার বাবা একদিন ভোরবেলা একটা পশ্চিম দিকের বড় রাস্তা দিয়ে আসছিল আর আমার মা ঠিক সেই সময়ে আসছিল উত্তর দিকের একটা গলি দিয়ে—হঠাৎ মোড়ের মাথায় দু'জনের দেখা হলো—আর সেই দেখা হওয়াই হলো এ্যাক্সিডেণ্ট।

বুঝতে পারলাম না। বললাম—কেন ?

সাহেব-বৌদি ওড়নার ঘোমটা সরিয়ে বললে—সে দেখা না হলে আর আমার জন্মই হতো না—

বললাম—তারপর ?

সাহেব-বৌদি বললে—তারপর আর কিছু নেই। আমি শুধু বড় হলাম, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশি, খেলা করি, আস্তে আস্তে বয়েস বাড়লো ! নিজের যৌবন নিয়েই আমি তখন মত্ত—দুনিয়ার কাউকে তখন কেয়ার করি না। সমস্ত জিনিসটাই ছিল আমার কাছে খেলা, জীবন নিয়েও খেলা, মৃত্যু নিয়েও খেলা, যৌবন নিয়েও খেলা, প্রেম নিয়েও খেলা ! খেলা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না।

বললাম—তারপর ?

সাহেব-বৌদি বলতে লাগলো—তারপর একদিন ভিন্‌সেণ্ট স্কোয়ারের রাস্তার ধারের দোকানগুলোর সামনে দিয়ে যাচ্ছি আমি আর আমার বন্ধু ডোরা। দুজনে খুব তখন বন্ধুত্ব। আমার নাম নোরা আর তার নাম ডোরা। সমান বয়েস দু'জনের। পাড়ার ছেলেরা ছড়া কাটতো আমাদের দেখে।

কত রকমের সব ছড়া। আমাদের দেখে ছেলেরা ছড়া না-কাটলেই বরং খারাপ লাগতো। আসলে ভালো লাগতো তাদের অত্যাচার।

ন আমার নিজের যৌবন নিজের কাছেই ভারী হয়ে উঠেছে। রাত্রে শুয়ে কষ্ট পাই, ঘুমিয়ে সুখ নেই, জেগে সুখ নেই, খেয়ে সুখ নেই, উপোস করে সুখ নেই। রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে নাচতে নাচতে যাই। পোশাকের দোকানের শো-কেসগুলোর ভেতর ভালো ভালো সিল্কের ফ্রক গাউনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। দামটা লেখা থাকে—সেটাও পড়ি। একদিন হঠাৎ একটা সুন্দর চেহারার ইটালিয়ানকে দেখিয়ে ডোরা বললে—ওই লোকটাকে আচমকা চুমু খেয়ে চমকে দিতে পারিস্ ?

সাহেব-বৌদি থামলো।

বললাম—তারপর ?

সাহেব-বৌদি বললে—তোমায় তো বলেছি তুষ্টু ঠাকুরপো—তখন সবই ছিল আমাদের খেলা—জীবন, যৌবন, প্রেম, মৃত্যু, সব ! সবটাই ছেলেখেলা। পুরুষকে পুরুষ মনে করতাম না, মেয়েকে মেয়ে মনে করতাম না—আমাদের দেশ তো তোমাদের দেশের মত নয়—আমরা বেশি বয়েসেও ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে মিশি, একসঙ্গে খেলা করি। একসঙ্গে নাচি, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়ি, একটা মেয়ে হয়ত দশটা ছেলেকে একসঙ্গে ভালোবাসি, আবার হয়ত দশটা মেয়ে একসঙ্গে একটা ছেলেকে ভালোবাসি—

বললাম—তারপর ?

সাহেব-বৌদি বললে—ডোরা বললে, যদি ওই ইটালিয়ানটাকে চুমু খেয়ে পালিয়ে আসতে পারিস্ তো···

আমি বললাম—কত বাজি ?

ডোরা বললে—এক শিলিং—

জিজ্ঞেস করলাম—বাজি লড়লে সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি বললে—হ্যাঁ লড়লাম, এ-রকম বাজি আমরা সব জিনিসেই লড়তাম, এইটেই ছিল আমাদের প্রধান খেলা।—

বললাম—তারপর ?

সাহেব-বৌদি বলতে লাগলো—ইটালিয়ানটার সুন্দর চেহারা, জন গিলবার্টের মত গোঁফ, সোনালী কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, তাকে চুমু খেতে গেলে আমাকে লাফিয়ে তার ঘাড়ের ওপর উঠতে হবে—কিন্তু তা হোক, বাজি তো বাজিই! তা সেই বাজি ধরতে গিয়েই একটা মহা এ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে গেল—

অবাক্ হয়ে গেলাম—এ্যাক্সিডেণ্ট?

সাহেব-বৌদি বললে—হ্যাঁ, দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেই বাজি ধরতে গিয়েই। নইলে কি আমায় এই ইণ্ডিয়ায় আসতে হয়, না এই রাজপুতানীর পোশাকে আবু পাহাড়ে আসতে হয়—

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু সেই বাজি? বাজি তুমি জিতলে সাহেব-বৌদি?

সাহেব বৌদির চোখ দিয়ে আবার ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। আবার চোখের জলের ছায়ায় গায়ের হীরের গয়নাগুলো ঝকমক করে উঠল—জরির কাজ করা বেনারসী ওড়না আবার ভিজে গেল। সে-জল চোখ থেকে টপটপ করে ঝরে পড়তে লাগলো হুইস্কির গ্লাসের ওপর।

চোখ-মুখ মুছে নিয়ে সাহেব বৌদি বললে—তবে শোন্—যখন বলতে বসেছি—সবই বলবো তোকে আজ—সবই বলবো—

কিন্তু সাহেব-বৌদির গল্প লিখতে গিয়ে আজ সব দেখছি ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আগেকার লাইনগুলো পড়তে গিয়ে দেখি ভুল করে শেষের কথাই আগে বলে ফেলেছি। গল্পের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমপরিণতির নিয়ম অনুসারে বললেই তো আপনারা গল্পটা ঠিক বুঝতে পারবেন।

এবার সেই গোড়া থেকেই বলি আবার।

অলোকেশদা' হাইকোর্টে যায় আর কাজ নিয়ে ডুবে থাকে।

আর সাহেব-বৌদিও হিন্দু ঘরের বৌ-এর মত ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন।

সেই অবস্থায় একদিন আমাদের বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেল।

রাঙা-কাকীমা বললে—কী করে হলো গো?

বড় জ্যাঠাইমা বললে—কে জানে বাপু, মদ-টদ খেয়েছিল বোধহয়—

মা বললে—অলোকেশ আবার মদ খায় কবে বড়দি?

বড় জ্যাঠাইমা বললে—খায় না তুই জানিস্? মেমসাহেব বিড়ি খেতে পারে আর মদ খাবে তার আবার কথা কী! দেবী খায় আর ছাবা খায় না—তা কি হতে পারে? লুকিয়ে লুকিয়ে ওরা কী খায় কে জানবে মা—ভূতের বাপেরও সাধ্যি নেই জানে। বলে গরু খায় যারা তাদের আবার জাত তাদের আবার ধর্ম—

পরের দিন খবর পেলাম অলোকেশদা'র অসুখ।

সামান্য অসুখ নয়। ডাক্তারে ডাক্তারে ছেয়ে গেছে বাড়ি। রাস্তায় সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাবা, রাঙা-কাকা, বড় জ্যাঠামশাই সবাই গেলেন দেখতে। আমিও আস্তে আস্তে গেলাম। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। একটা নিঃশব্দ আতঙ্ক যেন সারা বাড়িময় টিপি টিপি পায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন ভালো করে তাকাতে ভয় করে, ভালো করে পা ফেলতে ভয় করে,ভালো করে কথা বলতেও ভয় করে।

দূর থেকে শুধু দেখলাম সাহেব-বৌদি অলোকেশদা'র মাথার কাছে বসে আছে একটা চেয়ারে। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সাবিত্রী-সত্যবানের ছবি দেখেছিলাম। সাহেব-বৌদিকেও যেন ঠিক সতী সাবিত্রীর মত দেখাচ্ছে। লালপাড় একটা তাঁতের সাদা শাড়ি, মাথায় চুলগুলো পিঠে এলিয়ে দেওয়া। সিঁথিতে জব্‌জবে করে সিঁদুরের দাগ আর কপালে একটা সিঁদুরের মস্ত টিপ। কী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। দিনের পর দিন উপোস করে অলোকেশদা'র পাশে বসে আছে। একবার পাশ ছেড়ে উঠছে না। বাড়িতে খেতে

বলবারও কেউ নেই—সেবা-যত্ন-আত্তি করবারও কেউ নেই। তবু মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো সে-মুখে কোথাও যেন উদ্বেগ নেই—ধীর স্থির মূর্তি। ঘরের আশে-পাশের লোকজনের আনা-গোনার বিরাম নেই। ডাক্তার আসছে যাচ্ছে, রোগীকে পরীক্ষা করছে। ওষুধের গন্ধ, বরফ, পেনিসিলন কিছু বাকী নেই। কিন্তু কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই সাহেব-বৌদির। যেন সাহেব-বৌদি অলোকেশদা'র ধ্যান করছে। আমাকে দেখেও যেন দেখতে পায়নি।

মনে আছে, আমাদের ইস্কুলের দরোয়ানের ঘরের পাশে অশ্বত্থ গাছের তলায় শিবের বেদীতে গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে প্রার্থনা করেছিলাম।

বলেছিলুম—সাহেব-বৌদি আমাদের হিন্দু মেয়ে নয় ঠাকুর। আমাদের দেশের মেয়েও নয়—তার জন্যে তোমার মাথা-ব্যথা নেই জানি, কিন্তু দয়া করে তাকে শান্তি দাও ঠাকুর—অলোকেশদা'কে ভালো করে দাও—

তারপর কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর সামনে একটা গীর্জা ছিল। সেখানে গিয়েও রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছি। জানি না ভেতরে মূর্তি ছিল কিনা। তবু সেই অদৃশ্য দেবীকে উদ্দেশ করে বলেছি—সাহেব-বৌদি তোমার দেশের মেয়ে ঠাকুর, এখানে এসে বিপদে পড়েছে, স্বামী তার অসুখে অজ্ঞান হয়ে আছে, এখন-যায় তখন-যায় অবস্থা, তার অবস্থা ভালো করে দাও ঠাকুর—সাহেব-বৌদি শান্তি পায়, যেন—

তারপর ফেরার পথে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে মা-কালীর কাছে একই প্রার্থনা জানিয়েছি। পেসাদ নিয়ে এসেছি খুরিতে করে, সাহেব-বৌদি সে পেসাদ ভক্তিভরে খেয়েছে, খেয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছে। শালপাতা থেকে তেল-সিঁদুর নিয়ে কপালে টিপ দিয়েছে।

তবু আমি সাহেব-বৌদির ধৈর্য আর স্থিরতা দেখে অবাক্ হয়ে গেছি। আমার মা, রাঙা-কাকীমা, বড় জ্যাঠাইমারও এমন ভক্তি

দেখিনি, এমন নিষ্ঠা দেখিনি। অলোকেশদা'র জন্যে কী না করতে পারতো সাহেব-বৌদি। জলপড়া খাওয়ালে যদি অলোকেশদা'র রোগ সেরে যায় তো তাই খাওয়াব। কালী ঠাকুরের প্রসাদ খেলে যদি ভালো হয় তো তাই খাবো। দিনের পর দিন শুধু সেবা আর উৎকণ্ঠা। কিন্তু বাইরের লোক সে উৎকণ্ঠার কোনও আভাস কেউ জানতে পারবে না।

বড় জ্যাঠাইমাও বলতে বাধ্য হলো—ধন্যি মেম বিয়ে করেছিল অলোকেশ—

রাঙা-কাকী বললে—অলকের বিছানা ছেড়ে একটু ওঠে না গো, মেম-সাহেব হয়ে এতও পারে দিদি—

বাবা বললেন—পারে, পারে—আমাদের অফিসের ডিকিনসন সাহেবের বউও তো কালীপুজোর পেসাদ খেতো—

মেয়ে পেল্লাদ যে বলেছিল সে কিছু অন্যায় বলেনি।

মনে হল আমি যেন সাহেব-বৌদির আসল রূপটাই এতদিনে দেখতে পেলাম। শুধু মেম-সাহেব নয়, শুধু হিন্দু নয়, শুধু মুসলমানও নয়। নারী পুরুষের বাইরের রূপের আড়ালে আসল মানুষটা তো সব সময় প্রকাশ পায় না। ড্রইংরুমের মানুষ তো খাঁটি মানুষও নয়। মনে হলো—সাহেব-বৌদিকে এতদিন যে-দেখা দিয়ে দেখেছি, যে-ভাবা দিয়ে ভেবেছি, সেইটেই তার সর্বস্ব নয়, এই অলোকেশদা'র অসুখের মধ্যে দিয়েই বুঝি সাহেব-বৌদির সত্যিকারের রূপটা চেনা গেল। কিন্তু হায়রে কপাল! মানুষ চেনা কি অতই সহজ। ময়লা কাপড় আর ফরসা রঙ দিয়েই আজো বিচার করতে চাই মানুষকে! মানুষ কি অঙ্ক যে কষে মেলাতে পারলেই বলা যায়—জানা আমার হয়ে গেল।

কিন্তু জানতে তখনও আমার অনেক বাকি!

সেই অলোকেশদা' যেদিন মারা গেল সেদিনও দেখলাম সাহেব-বৌদির অপূর্ব রূপ। যে সাহেব-বৌদির চোখে পরে অত জল

দেখেছিলাম, সেই সাহেব-বৌদিও সেদিন যেন শোকে শুকিয়ে গিয়েছিল। কারো শোকে যে মানুষ অত সুন্দর হয়, অত পবিত্র হয়, অত স্নিগ্ধ হয় তাও সেদিন প্রথম জানলাম। জানলাম—সংসারে শোক শোনবাব অবসব মানুষেব বেশি নেই। সংসার বলে—যে গেছে সে যাক, যে বইল তাব খবব বল। যে গেল সে তো গেলই—তুমি তো আছো, সুতবাং তোমাকেই কেবল আমি স্বীকার কবি। তোমাব সঙ্গেই আমার বিবাদ, প্রণয়, পবিণয়, প্রতিযোগিতা যা কিছু সব। মনে আছে—চুপি চুপি নির্জন বাড়িটায একলা গিয়েছিলাম সাহেব বৌদিকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু সান্ত্বনা দেব কি, আমাকেই যেন সাহেব-বৌদিব সান্ত্বনা দেবাব পালা।

সাহেব বৌদি বললে—ছি, চুপ কব, কাঁদতে নেই—কাঁদে না—

কিন্তু সাহেব-বৌদিব সান্ত্বনাতে আমাব কান্না যেন আরো বেড়ে গেল।

সাহেব বৌদি আমাব মাথায হাত বুলিযে দিতে দিতে বললে—সব মানুষ কি চিবকাল বাঁচে—একদিন সকলকেই মরতে হবে—তুই আমি সংসাবেব কেউ চিবকাল বাচবো না—সবাই যাবো—কেউ আগে আব কেউ পবে—

সাহেব বৌদির কথাগুলো কে না জানে। কে না শুনেছে! কিন্তু তবু কেমন আশ্চর্য লাগলো! আশ্চর্য লাগলো সাহেব-বৌদির মুখ থেকে ওই কথাগুলো শুনে।

বললাম—এতদিনে বুঝলাম—তুমি ভণ্ড সাহেব-বৌদি—তুমি অলোকেশদা'কে মোটে ভালোবাসতে না—

সাহেব-বৌদি সেই শোকেব মধ্যেও হাসতে লাগলো। বড় মিষ্টি লাগলো সে হাসি।

বললে—ভালোবাসার তুই কি জানিস্ বে—এই টুকুন ছেলে?

বললাম—আমি সব জানি—তোমরা মেম-সাহেবেরা ভালোবাসতে পারো না—

সাহেব-বৌদি তবু সেই মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলো।

বললে—সমস্ত জাতের নামে দোষ দিলি একেবারে ?

বললাম—তবে অলোকেশদা' মারা যাওয়াতে তুমি কাঁদলে না কেন ?

সাহেব-বৌদি বললে—কাঁদলে বুঝি ভালোবাসা দেখানো হয় ?

বললাম—যে ভালবাসে সে না কেঁদে কি থাকতে পারে ?

সাহেব-বৌদি কী যেন বলতে গেল। কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—যাক্ তোর সঙ্গে আর ও-সব আলোচনা করবো না—তুই বুঝতে পারবি না—

বললাম—ওই বলে তুমি তো এড়িয়ে গেলে—কিন্তু লোকে যে তোমায় নিন্দে করে, তার বেলায় ?

সাহেব-বৌদি বললে—আমাকে নিন্দে করলে তোর কী, শুনি ?

বললাম—বা রে, কেন তোমাকে নিন্দে করবে ওরা ?

সাহেব-বৌদি বললে—করুক গে, আগেও ভালো বলেনি—এখনও বলছে না—আর তা ছাড়া···বলতে বলতে একটু থেমে গিয়ে আবার বললে—আর তা ছাড়া যার জন্যে এত দূর এলাম, কত কষ্ট করে নিজের দেশ ভুললাম, নিজের ধর্ম ভুললাম, নিজের সমাজ ভুললাম, শাড়ি পরলাম, টিপ, সিঁদুর, আলতা পরলাম—কত কষ্ট স্বীকার করলাম, সে-ই যখন রইল না আর, তখন কে কী বললে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবো না—

বললাম—ওরা সবাই বলে তুমি নাকি এবার আবার বিলেত চলে যাবে—

সাহেব-বৌদি তেমনি হেসেই বললে—বলে নাকি ?

বললাম—বলেই তো—তোমার ভাবনা কি সাহেব-বৌদি, তোমরা কত বড়লোক, তুমি দেশে ফিরে গেলে কত আনন্দ তোমার—আবার বাবা-মা'কে দেখতে পাবে—

সাহেব-বৌদি এ-কথার কোন জবাব দিলে না। কথাটা শুনে যেন কী ভাবতে লাগলো। যেন আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

একটু থেমে বললাম—সত্যি তুমি চলে যাবে সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি হঠাৎ বললে—তুই বাড়ি যা ছুট্টু। আমার এখন একটু একলা থাকতে ইচ্ছে করছে—তোর দুটি হাত ধরে মিনতি করে বলছি তুই বাড়ি যা আজ—

একটু অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম—কেন সাহেব-বৌদি ? আমি কি করেছি ?

সাহেব-বৌদি বললে—পরে বলবো সে-সব, তুই এখন যা ভাই—বলে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু সাহেব-বৌদি যেন ক্রমেই আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো। আর চেনা দুষ্কর হয়ে গেল সাহেব-বৌদিকে।

সাহেব-বৌদির যে রূপ দেখেছি অলোকেশদা'র বাড়িতে, অলোকেশদা'র সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে গিয়ে কিম্বা পাড়ার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ব্যবহারে, এ তার যেন কিছুই না। আমরা সবাই আশা করেছিলাম সাহেব-বৌদি এবার সোজা বিলেতে চলে যাবে। স্বামী মারা যাবার আগেই কত মেম-সাহেব বউ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বিলেতে চলে গেছে, আর এ স্বামীর মৃত্যুর পর তো কথাই নেই।

সেন,জ্যাঠামশাই-এর আর কেউ ছিল না এক অলোকেশদা' ছাড়া। কিন্তু অলোকেশদা'র মৃত্যুর পর এক খুড়তুতো ভাই কোথা থেকে এসে হাজির।

সাহেব-বৌদি তখন সম্পূর্ণ হিন্দু বিধবা। মাথার চুল ছোট ছোট করে আবার ছেঁটে ফেললে। সিঁদুর মুছে ফেললে। থান পরতে লাগলো। একবেলা উপোস। নিরামিষ খাওয়া। পেঁয়াজ, রসুন, মুসুর ডাল পর্যন্ত বাদ। একাদশী পূর্ণিমা সব মানতে লাগলো।

রাঙা-কাকীমা বললে—অনেক মেম-সাহেব বউ দেখেছি মা, এমনটি দেখিনি—

বড় জ্যাঠাইমা বললে—শুনলাম নাকি আবার—পাথরের থালায় খায়—

মা বললে—তখন তো সবাই বিড়ি খায় বলে নিন্দে করেছিলে—এবার ?

বাবা বললেন—এবার সাহেব-বৌমা ঠিক মন্ত্র নেবে দেখো—ওরকম হয়—আমাদের ডিকিনসন সাহেবের বউও মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল শেষকালে—

সত্যিই তখন যেন আর চিনতে পারা যেত না সাহেব-বৌদিকে। সোনালি চুল আগেই ছিল—বিধবা হবার পর আরো রুক্ষ হয়ে গেল। সকালবেলা উঠে পুজো করতে বসে। তারপর নিজের আলোচালের চারটি ভাত নিজেই নামিয়ে নেয়। তখন আর কোনও কাজ নেই। অলোকেশদা'র বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা। কোথাও কোনও জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই। একটা চাকর আছে, বাজার করে, আর এটা-ওটা করে। কাউকে ছাড়ায় নি সাহেব-বৌদি।

সেদিন আবার সাহেব-বৌদির কাছে যেতেই দেখি পুজোর আয়োজন করছে।

আমাকে দেখে বললে—এসেছিস্? ভালোই হয়েছে—আজ পুরুত ঠাকুর ভাগবত পড়তে আসবেন—

বললাম—তুমি এ-সবে বিশ্বাস করো সাহেব-বৌদি ? ৮৩

সাহেব-বৌদিও হাসলো। বললে—বিশ্বাস কি কাকে, এ চেটে ভেবেছিস্ ?

বললাম—তা ঠিক—অবিশ্বাস করার চেয়ে বিশ্বাসের ভান করাও ভালো—কী বলো।

সাহেব বৌদি বললে—আমার বেলায় সবই ভান—তা এই আমার কপাল !

বললাম—তা এ-সবও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে বলতে চাও ?

সাহেব-বৌদি বললে—তোকে কে বিশ্বাস করতে বলেছে—? আর অন্য লোকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমারই-বা কি এল-গেল শুনি?

বললাম—আমার কিন্তু প্রাণে লাগে সাহেব-বৌদি,—তোমার হয়ত মনে নেই, কিন্তু আমিই একদিন কত যত্নে তোমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছি, কপালে টিপ পরিয়ে দিয়েছি—সে-কথা যে ভুলতে পারি না—

সাহেব-বৌদি হাসলো। বললে—অলক বলতো—ওকে বিয়ে করে আমি নাকি খুব কষ্ট পাচ্ছি—অথচ দেখতো—কষ্ট কেউ কাউকে দিতে পারে? আঘাত কেউ কাউকে করতে পারে? কষ্ট যদি পেয়েই থাকি তো তার জন্যে কেউ দায়ী নয়, অলকও নয়—তুইও নোস—আমিও নই—

কথা বলতে বলতে সাহেব-বৌদিকে যেন আবার সেইরকম সুন্দর মনে হলো। বাইরে বৈধব্যের অন্তরালে আবার যেন মনের সেই রঙ ফুটে বেরোল।

সাহেব-বৌদি বলতে লাগলো—মা বলতো—খেলাই তোর একদিন কাল হবে, দেখিস্—তা তখন কেবল মনে হতো খেলা ছাড়া আর কী আছে জীবনে। মনে হতো—ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি সব, জীবন, যৌবন, স্বাস্থ্য, সম্মান সবই ছিল আমার কাছে খেলার সামগ্রী—তা সত্যিই ভাই সেই খেলাই আমার কাল হলো—

বললাম—কী রকম?

সাহেব-বৌদি বললে—কারো কথা কি তখন শুনেছি! নিজের যা ভালো মনে হয়েছে তাই করেছি—পাড়ার লোক আমাদের দু'জনের জ্বালায় অস্থির ছিল—আমি আর ডোরা। অথচ দুজনের মধ্যে ভুলটা করলাম আমিই—

জিজ্ঞেস করলাম—কী ভুল?

সাহেব-বৌদি বললে—জানিস্ তো জীবনে একটা ভুল করলে

মানুষ আরো দশটা ভুল দিয়ে সেটাকে চাপতে চায়, ঢাকতে চায়! ভুলের বাচ্চা হয় কিনা। একটা ছোট ভুলের দেনা দশটা ভুলের সুদ দিয়ে সুদে-আসলে শোধ করতে হয়—আমিও তাই করছি—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু ভুলটা কী?

সাহেব-বৌদি বললে—ঠিক ভুল নয়—

বললাম—ভুল নয় তো কী?

সাহেব-বৌদি বললে—এ্যাক্সিডেন্ট—দুর্ঘটনা—

তারপর একটু থেমে বললে—তুই সব কথা শুনতে চাস্‌নে, শুনলে বুঝতেও পারবিনে—আরো বড় হ—তখন বলবো—

বললাম—তখন কি আর তুমি থাকবে? তখন কি আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

সাহেব-বৌদি বললে—কেন, আমি থাকবো না তো যাবো কোথায়?

যেন বাঁচলাম কথাটা শুনে। তবু যে-কথাটা বলি বলি করেও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল না, সেই কথাটাই বললাম—

বললাম—ওরা নাকি তোমার নামে মামলা করেছে সাহেব-বৌদি?

সাহেব-বৌদির মুখে কিন্তু এতটুকু ভাবান্তর হলো না। যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইল। বললে—তোর কানেও গেছে?

বললাম—অলোকেশদা' নেই, এ দেশে কেউ-ই নেই তোমার; এখন মামলা মকদ্দমা হলে কে ঘোরাঘুরি করবে, দেখা শোনা করবে?

সাহেব-বৌদি চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল। কিছু উত্তর দিলে না।

তারপর বললে—দেখ, অলক লোকটা ছিল খুব ভালো, মনটা খুব সরল—আমরা ও-দেশের মেয়ে, ছোটবেলা থেকে নানান্ পুরুষের

সঙ্গে মিশেছি, পুরুষ মানুষের ঠোঁট নড়া, হাতের আঙুল নড়া দেখে বলে দিতে পারি তারা কী চায়, আমরা এ-দেশের মেয়েদের মত পুরুষ দেখতে চিনতে সহজে ভুল করি না—। অনেক পুরুষের সঙ্গে ঘরে বাইরে, সমাজে, নাচে, গীর্জায় নানাভাবে আমরা মিশেছি, তবু বলছি অলক লোকটা ছিল ভালো—

আমি চুপ করে শুনে যেতে লাগলাম।

সাহেব-বৌদি বলল—এখানকার অনেক ছেলে ওদেশে গিয়ে কত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে, যার এখানে অবস্থা খুব খারাপ, সে-ও ওখানে গিয়ে প্রিন্স সেজে বসে—টাকা দেখায়, মোহর দেখায়, কিন্তু অলক এ-সব কিছুই দেখায় নি—

জিজ্ঞেস করলাম—অলোকেশদা'র সঙ্গে তোমার পরিচয় কী করে হলো সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—যতদিন ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াতাম মনে হতো এই-ই বেশ, সারা জীবনটাই যেন ইয়ার্কি . পুরুষ মানুষ টাকা উপায় করবে, খাওয়াবে, পরাবে, সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবে, আমাকে সুখে রাখার দায়িত্বটা বুঝি একলা তারই আব আমাব বুঝি কেবল খেলা করাই কাজ—

তারপর আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল।

সাহেব-বৌদি আবার বলতে লাগলো—সে আমাকে আদর করবে কখন, সেই জন্যে সাজবো, সে আমার গান শুনলে খুশী হবে, তাই গান শিখবো, তার সঙ্গে নাচলে সে আনন্দ পাবে, উত্তেজনা পাবে, তাই নাচবো—এ-ছাড়া যেন আর আমার কোনই কাজ নেই—

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু ভুল আমার ভাঙলো ভাই—অলককে বিয়ে করে এখানে আসার পরই আমার ভুল ভাঙলো—অলককে বিয়ে না করে অন্য কাউকে বিয়ে করলেও হয়ত ভুল ভাঙতো—আর ভুল আমার ভাঙার দরকারও ছিল—

বললাম—কেন ?

সাহেব-বৌদি বললে—তোমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়—আর আমরা বিয়ে করি—

সাহেব-বৌদি আবার বলতে লাগলো—আমাদের মেয়েদের সমাজে তাই সংযমটা আরো দরকার—পছন্দে একটু ভুল হলো কি মরলো, প্রেমে একটু খাদ মিশলো তো গেল,—আমাদেরটা আইন আর তোদেরটা নিয়ম। আইন বদলানো চলে—ছেড়ে চলে গেলেও চলে, কিন্তু সকালবেলা পুব দিকে সূর্য ওঠার মত নিয়মকে আব বদলানো যায় না—

বললাম—কিন্তু তুমি তো আইন বেঁধে বিয়ে করেছিলে অলোকেশদা'কে? ছেড়ে চলে গেলেই পারতে?

সাহেব-বৌদি বললে—কোথায় যাবো?

বললাম—তোমার যাবার জায়গার অভাব? অলোকেশদা'র সব টাকা তো তুমি পেয়েছ? কেন তুমি এত কষ্ট করছো?

সাহেব-বৌদি বললে—সবাই অবাক্ হয়ে গেছে খুব, না?

বললাম—অবাক্ হয়ে তো যাবেই, এদেশে যারাই মেম বিয়ে করে এনেছে, স্বামী মারা যাবার পর কেউ আব এদেশে থাকেনি—

সাহেব-বৌদি কী যেন ভাবলো একটু। তারপর বললে—আমার মত কারো জীবনে তো দুর্ঘটনা ঘটেনি—

বললাম—এ্যাক্সিডেণ্ট?

—হ্যাঁ, এ্যাক্সিডেণ্ট!

মেয়েদের যারা রহস্যময়ী বলে থাকে আমি কিন্তু তাদের দলে নই। মেয়েরা যদি রহস্যময়ী হয় তো পুরুষরাও রহস্যময়। মানুষ মাত্রেরই রহস্য আছে। যতক্ষণ পরের মনের কথা দেখতে পাচ্ছি না, ততক্ষণ তা রহস্য তো বটেই।

সাহেব-বৌদিকেও আমার কোনদিন রহস্যময়ী বলে মনে হয়নি।

আমাদের দু'জনের বয়েসের ছিল অনেক পার্থক্য। আমি প্রায় সাহেব-বৌদির ছেলের বয়সী। ছেলে সাহেব-বৌদির হয়নি কিন্তু হলে আমার বয়েসের হতে পারতো। সাহেব-বৌদি ছিল প্রায় অলোকেশদা'র সম বয়েসী। মনে হতো—এমন কোনও দুর্ঘটনা আছে হয়ত যা আমাকে বলা যায় না। কিম্বা এত বেদনাদায়ক যা বলতে কষ্ট হয়। আর আমিও পীড়াপীড়ি করিনি তাই।

এর পর আমার বয়েস বাড়লো। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করতে লাগলুম। শাসন যেমন কমলো, স্বাধীনতা যেমন পেলুম, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কাছের মানুষ-গুলোও যেন সবাই দূরে চলে গেল। আগে যে মেয়েরা কাছে ডেকে কথা বলেছে, তারা এখন দেখলে একটু সচেতন হয়। মেজদা দাড়ি কামাতে শুরু করেছে। ধুতির নিচে আণ্ডারওয়ার পরে।

মাসতুতো দিদির সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। বললে—তোর গলা এত মোটা হ'ল কেন রে ?

লুকিয়ে লুকিয়ে নানারকম বই পড়ে তখন অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞানও হয়ে গেছে। কলেজের বন্ধুরা ক্লাসে পড়ার বই-এর সঙ্গে অন্য বইও নিয়ে আসে। তাদের জীবনের অনেক গল্প শোনায়। লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখে আসি।

বাবা বলেন—এত রোগা হয়ে যাচ্ছিস্ কেন ?

আর যখন কোনও কাজ থাকতো না হাতে, যেতাম সাহেব-বৌদির কাছে। সেই আগেকার সান্নিধ্য আর পেতাম না বটে কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহেব-বৌদিকে মিলিয়ে নিতাম। আরো তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখতাম সাহেব-বৌদিকে। আগে ছোটবেলায় যে-পা জোড়া কোলে নিয়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছি, সেই পায়ের দিকেও লোলুপ চোখে চেয়ে দেখতাম। এখন বড় হয়ে গেছি, এখন সে-অধিকার আমার ঘুচে গেছে। সাহেব-বৌদির কাছে বসতে পেতাম না আর। বসতে ইচ্ছা থাকলেও সাহেব-বৌদি দূরে দূরেই বসে

থাকতো। গল্প করতো আগেকার মতই কিন্তু আগেকার সেই আমেজ যেন পেতাম না আর। শুধু সাহেব-বৌদিই নয়, সমস্ত পৃথিবীই যেন দূরে চলে গেল। আমি একলা হয়ে গেলাম। বাবা মা'র কাছেও আর আগেকার মত ঘন ঘন যাই না, সাহেব-বৌদির কাছেও না। দরজা-বন্ধ একলা ঘরে থাকতেই যেন তখন বেশি ভাল লাগে আমার!

এরই মধ্যে একদিন শুনলাম মকদ্দমায় সাহেব-বৌদিব হার হয়েছে।

খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে সাহেব-বৌদির বাড়ি গেলাম।

সাহেব-বৌদি কী একটা কাজ করছিল।

বললাম—তুমি কোথায় যাবে এবার বৌদি?

সাহেব-বৌদি তেমনি মিষ্টি চোখে আমাব দিকে তাকাল।

বললে—আমার জন্যে তোব যেন ঘুম হচ্ছে না।

বললাম—ঘুম আমার সত্যিই হচ্ছে না সাহেব-বৌদি—

সাহেব-বৌদি বললে—আমাব কাছে ঘুমেব ওষুধ আছে, খাবি?

বললাম—তোমারও কি ঘুম হয় না সাহেব-বৌদি?

আশ্চর্য! শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—সাহেব-বৌদি নাকি কোর্টে গিয়ে বলে এসেছে বাড়ি ছেড়ে দেবে—শুধু মাস দুএক সময় চাই। দু'মাসের মধ্যেই একটা কোনও ব্যবস্থা করে নিতে পারবে আর তা না করে নিতে পারলেও বাড়ি নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে।

বললাম—কেন তুমি আপীল করলে না সাহেব-বৌদি? তোমারই তো বাড়ি? কোথাকার অলোকেশদা'র কোন খুড়তুতো ভাই আজ কোথা থেকে উড়ে এসে বাড়ি দখল করতে চায়—কেন তুমি রাজী হতে গেলে?

সাহেব-বৌদি আবার হাসলো। বললে—এ বোধ হয় ভালোই হ'ল রে—

বললাম—তুমি বুঝি বিলেত চলে যাবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—যে দেশ থেকে মুখ পড়িয়ে এসেছি—সেখানে আর ফিরে যাবো না—

বললাম—অলোকেশদা'কে বিয়ে করে কি সত্যিই তোমার মুখ পুড়েছে ?

সাহেব-বৌদি বললে—শুধু কি মুখ ? কী পুড়তে বাকি আছে বল্ ? এ মুখ নিয়ে সেখানে গেলে সবাই চুনকালি লাগিয়ে দেবে, —তখন সবাই বারণ করেছিল অত করে—

বললাম—সত্যিই তো, কেনই বা অলোকেশদা'কে বিয়ে করতে গেলে তুমি ? আর এদেশের কত লোকই তো মেম বিয়ে করে নিয়ে এসেছে—কারোর তো মুখ পোড়েনি, বনিবনা না হলেই আবার ছেলেমেয়ে নিয়েই ফিরে চলে গিয়েছে নিজের দেশে—

সাহেব-বৌদি কিছু বললে না, চুপ করে রইল।

বললাম—তোমাদের অত টাকা,—তোমাদের নিজের বাড়ি রয়েছে—তোমার ভাবনা কি সাহেব-বৌদি ? তুমি কেন এখানে থেকে এই থান পরে, বিধবা সেজে কষ্ট করবে—তোমার কিসের দায় ?

তারপর একটু থেমে আবার বললাম—আর অলোকেশদা' তো অনেক টাকা উপায় করতো—হাজার হাজার টাকা তার মাসে আয় ছিল, এত বছরে অনেক জমেছে, সেই টাকা দিয়ে এ-বাড়িটা কিনে নাও না—? আর ওরাও তোমার কাছে যখন বেচতে রাজী—

সাহেব-বৌদি তেমনি হাসতে লাগলো মিষ্টি মিষ্টি।

বললে—কিছু নেই রে, কিচ্ছু আমার হাতে নেই—কালকে কী খাবো তার পয়সাও নেই—

সাহেব-বৌদি আবার বললে—নেই বলেই তো এ্যাটর্নী ব্যারিস্টারকে বেশি টাকা দিতে পারলাম না—আর বিদেশী মেয়ে বলে কেউ আমায় সাহায্যও করলে না—কতদিন কোর্টে গিয়ে ঘোরাঘুরি করলুম—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শুনতাম অলোকেশদা'র মাসে উপায় ছিল পাঁচ ছ'হাজার টাকা! এত বছরে কত টাকা জমবার কথা। সব কিসে গেল! কেমন করে উড়লো! অথচ সাহেব-বৌদি তো তেমন বিলাসিতা করতো না। তখন মনে পড়ে গেল—কেন সাহেব-বৌদি গাড়ি বেচে দিয়েছে, ঝি-চাকর ছাড়িয়ে দিয়েছে। একবেলা খায়। হঠাৎ চারদিকে চেয়ে সাহেব-বৌদির দারিদ্র্য যেন চোখে প্রখর হয়ে বিঁধতে লাগলো। এতদিন যেটাকে সাহেব-বৌদির শোকের প্রতীক বলে মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি, আজ তা দারিদ্র্য বলে মনে হওয়াতে যেন করুণা হ'ল। সাহেব-বৌদিকে যেন আগের চেয়েও আরো ভালো লাগলো। মনে হ'ল যেন এতদিনে সাহেব-বৌদির সত্যিই ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছি, সত্যিকারের সান্নিধ্য পেয়েছি। নিজের নিঃসঙ্গতায় যে অভাববোধ মনে মনে পুষে রেখেছিলাম—তা যেন আজ একেবারে নিঃশেষ হলো। সাহেব-বৌদি এতদিনে বুঝি আমার আপন-জন হলো।

বললাম—কিছু মনে করো না সাহেব-বৌদি—একটা জিনিস তোমায় নিতে হবে—বলে পকেটে দু'টো টাকা ছিল, সে-দুটো বার করে সাহেব-বৌদির হাতে পুরে দিতে গেলাম।

বললাম—আমার কাছে তো আর কিছু নেই—

কিন্তু তার আগেই সাহেব-বৌদি খিলখিল করে হেসে উঠেছে। হাসিতে সাহেব-বৌদির সর্বাঙ্গ নেচে নেচে উঠতে লাগলো।

বললে—পাগলা ছেলে কোথাকার—আমি সব মিথ্যে কথা বললুম —আর তুই সব বিশ্বাস করলি, দূর, আমার বাবার কত টাকা—

আমি আরো অবাক্ হয়ে গেলাম। সাহেব-বৌদির এ আবার কী রসিকতা ভেবে বোবার মত হাঁ করে সাহেব-বৌদির মুখের ওপর শুধু চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে।

সাহেব-বৌদি তেমনি হাসতে হাসতে বললে—আমি বাপ-মায়ের একটি মাত্র আদুরে মেয়ে, আমি যদি চিঠি লিখে দিই, এখুনি হাজার-

হাজার টাকা আমার এখানকার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবে—তা জানিস্—

বললাম—তাই চিঠি লেখ না সাহেব-বৌদি—সেই টাকা দিয়ে এই বাড়িটা কিনে নাও না—

সাহেব-বৌদি বললে—দূর—তাতে অলকের স্মৃতিকে অপমান করা হয় যে—অলক স্বর্গে গেছে, সেখান থেকে সব দেখছে যে—

আমি তো আগেই বলেছি মেয়েদের যারা রহস্যময়ী বলে আমি তাদের দলে নই। মেয়েরা যদি রহস্যময়ী হয় তো পুরুষরাও রহস্যময়। তবু পুরুষদের নিয়ে না লিখে মেয়েদের নিয়ে কেন লিখি অনেকে এ-প্রশ্ন করে। তারা বলে, মেয়েদের এই কটাক্ষপাত করে আমি কী লাভ পাই! তার জবাব কাউকে দিইছি, কাউকে দিইনি। আমি যেমন ভাবে মানুষ, মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার পক্ষে তা ছিল অনুকূল। আর লাজুক প্রকৃতির বলে মেয়েরা আমাকে স্নেহও করেছে বরাবর। আর কটাক্ষ? কটাক্ষ যদি করে থাকি তো অশ্রুপাতও করেছি আড়ালে। চোখের জল দিয়ে যা পেয়েছি, বাইরের কটাক্ষ দিয়ে তা আড়াল করতেই তো চেয়েছি চিরকাল।

এই যেমন সাহেব-বৌদির বেলায়। এরপর যে দু'মাস সাহেব বৌদি নিজের বাড়িতে কাটিয়েছে, কখনও তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি।

তখন যুদ্ধের সময়। কলকাতা শহরে চাল, কাপড়, কেরোসিন তেল সবই দুষ্প্রাপ্য। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম, বড়-লোকেরাও সে-দুর্যোগ এড়াতে পারেনি। এক-একদিন সাহেব-বৌদির বাড়িতে গেছি, গিয়ে দেখেছি তালা-বন্ধ। কোথায় বেরিয়ে গেছে কখন, কেউ জানে না। নিজের মনেই আবার বাড়ি ফিরে এসেছি। আর ভেবেছি—কেমন করে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে সাহেব-বৌদি। মাত্র তো দু'টো মাস। দু'টো মাস দেখতে দেখতে যায়। একটা দিন একটা দিন করতে করতে গেল কতদিন।

সকালে গেছি, দেখি সাহেব-বৌদি নেই। দুপুরে গেছি, দেখি নেই। বিকেলে গেলে—নেই, রাত্রে গেছি—নেই। তবে কি সাহেব-বৌদি কোথাও চলে গেল। কে চাল কিনে আনে, তেল কিনে আনে, কে রান্না করে! ভেবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনি।

রাঙা-কাকীমা বলে—এবার দেখবো সতীপনা কোথায় থাকে—

বড় জ্যাঠাইমা বলে—এবার তল্পি-তল্পা গুটিয়ে বিলেত চলে যাবে—দেখো—

মা বলতো—আহা বড় কষ্ট মেম-সাহেবের, সত্যি—

একদিন আর কিছুতেই নিজেকে চেপে রাখতে পারলুম না। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লো আমি জেগে রইলাম। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম—সাহেব-বৌদি যদি বাড়ি আসে সামনে দিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে রাত হলো। দশটা বাজলো। তারপব রাত এগারোটা বাজলো। বাড়িব সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। দূরের বাড়িগুলোর জানালায় আলো নিভে গেল একে একে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেল ক্রমে। ফাঁকা রাস্তা। রাস্তার এ-চেহারা কোনও দিন দেখিনি। এত রাতে কোনও দিন জেগে থাকিনি। খানিক পরে মনে হলো যেন একজন বিধবা রাস্তা দিয়ে চলেছে। মাথায় ঘোমটা। কাছে এলে দেখলাম—ময়লা কাপড়, হাতে ভাতের থালা। গামছা ঢাকা। বোধহয় কোনও বাড়ির ঝি কাজ শেষ করে নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। একটা রিক্‌শা ঠুন ঠুন করে চলেছে, সামনে পর্দা ঢাকা। হয়ত সাহেব-বৌদির বাড়ির সামনে থামবে। দেখতে হবে কে নামে! কিন্তু না, রিক্‌শটা সাহেব-বৌদির বাড়ি ছাড়িয়ে গলি দিয়ে বেঁকে ওদিকে চলে গেল।

তারপর অনেক রাত হলো। একে একে রাত বারোটা বাজলো। গলির ওপাশে রাস্তার কুকুররা ঘেউ ঘেউ করে মাঝে মাঝে নৈশ-আবহাওয়া ফাটিয়ে চৌচির করে দিচ্ছে। ঘুমে চোখ ঢুলে এল। চোখের জলে একাকার হয়ে গেল সব দৃশ্য—সব ভাবনা।

ভাবলাম—এত বড় শহরে কোথায় আশ্রয় পাবে সাহেব-বৌদি। কেউ যে নেই তার। এ-শহরে প্রত্যেক বাড়িতে যখন সবাই নিশ্চিত-নির্ভর আরামের মধ্যে গা এলিয়ে দিয়েছে, সাহেব-বৌদি হয়ত বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও। সাহেব-বৌদির জন্যে কোনও আশ্রয়ের আশ্বাস কোথাও নেই। বিদেশী একটা মেয়ের জন্যে এখানকার সকলের দরজা রুদ্ধ হয়ে গেছে। সাহেব-বৌদি অলোকেশদা'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন একান্ত অভাবনীয়ভাবে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

বাবা, কাকারাও অবাক্ হয়ে গিয়েছিল!

বাবা বলতো—আমাদের ডিকিনসন্ সাহেবের বউ শেষে চুল ছাঁটার দোকান করেছিল পার্ক স্ট্রীটে—ডিকিন্‌সন্ সাহেবের অনেক টাকা পেয়েছিল তো—

কাকা বলতো—অলোকেশ কি লাইফ ইন্‌সিওরটাও করেনি?

বড় জ্যাঠামশাই বলতেন—কিছু কি আর জমিয়েছে ওরা, মেম-সাহেব বউ পোষা অত সোজা নয়—ওর চেয়ে হাতী পোষা সহজ যে—

সকলের কথা শুনতুম—আর মনে মনে অনেক ভাবনা হতো।

তখন যুদ্ধের হিড়িকে শহরের চেহারা বদলে গিয়েছে। রাতের বেলা ব্ল্যাক্ আউট। দিনের বেলায় আতঙ্ক। শহর ছাড়বার আয়োজন হচ্ছে। মিলিটারি লরি দল বেঁধে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যায়। রাস্তায় ঘাটে মিলিটারি সৈন্য ঘুরে বেড়ায়। কত রকম তাদের পোশাক, কত রকম পরিচ্ছদ। কত বিচিত্র চেহারা। সে-কলকাতা আর চেনাই যায় না। রেস্তোরাঁয় গেলে সব চেয়ার টেবিল দখল করে তারা বসে থাকে। গান গাইতে গাইতে শিষ দিতে দিতে তারা হুল্লোড় করে বেড়ায়। মেয়েদের অমর্যাদা করে, ভিখিরীদের ঝুলিতে টাকা ছুঁড়ে দেয়। দোকানের কাচ ভাঙে। মদ খেয়ে মাতামাতি করে। রিক্‌শাওলাকে রিক্‌শায় বসিয়ে নিজেরা রিক্‌শা নিয়ে টানে।

সে এক অরাজক রাজত্ব !

এরই মধ্যে কোথায় খুঁজে পাবো সাহেব-বৌদিকে। সাহেব-বৌদি কোথায় তলিয়ে গেল, কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল কে খবর রাখবে ! কার এত সময়, কার এত মাথাব্যথা এক বিদেশী মেয়েব জন্যে ! যার পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছি একদিন, যার কাছে গিয়ে মনের নিঃসঙ্গতা দূব করেছি, যার সঙ্গ লাভের জন্যে সকাল থেকে মুহূর্ত গুণেছি, সেই সাহেব-বৌদিকে আমার মত কে এমন ভালোবেসেছিল ! কে তাকে এমন আপন করে নিয়েছিল। অথচ বিলেতে ভিন্‌সেন্ট স্কোয়ারে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলেই যাব নামে হাজাব হাজার টাকা চলে আসে, তার এখানে পয়সাব অভাবে হয়ত উপোস করেই কাটছে ! হয়ত কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করে মুক্তি পেয়েছে। ভাবতেই কেমন গা টা শিব-শিব কবে উঠতো। হয়ত অলোকেশদা'র জন্যেই এই শোকেব তপস্যা সাহেব-বৌদিব। অলোকেশদা'র স্মৃতির ভাবে অবশ হয়ে আছে, তাই এই দুশ্চর পরিক্রমা। এই সাদা থান, এই বৈধব্য, এই বিলাসবিহীন জীবনযাত্রা, এই কৃচ্ছ্রসাধন।

কিন্তু মেম-সাহেব বৌ এব এই বৈধব্যের কাহিনী কেউ কখনও শুনেছে ! অন্তত আমি তো শুনিনি। আমি তো শুনিনি কোনও মেম-সাহেব বউ নিজের দেশ ছেড়ে এখানে এসে স্বামীর স্মৃতি নিয়ে জীবনপাত করেছে ! স্বামীব ভিটে, শ্বশুরের ভিটে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছে !

এ-ঘটনা কারো বিশ্বাস না হবারই কথা। জানি এ-ঘটনা কেউ বিশ্বাস করবেও না। কিন্তু কারো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামাতে হলে আব গল্প লেখা চলে না।

কিন্তু এর পরে যে-ঘটনা চোখে পড়লো তা আরো অবিশ্বাস্য ! আরো করুণ !

শুনেছি বাল্মীকির রামায়ণে রত্নাকরের গল্প নেই। রত্নাকরের গল্প কৃত্তিবাস কল্পনা করে কিম্বা কোথা থেকে নিয়ে তা জুড়ে দিয়েছিলেন। তা হোক, তবু রত্নাকরের গল্প আমরা বিশ্বাস করি। রাম, সীতা, রাবণকেও বিশ্বাস করি।

তখন যুদ্ধ জোরে বেধে উঠেছে। দিনের বেলা আতঙ্কে কাটে মানুষের, সেই আতঙ্ক সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর হয়। পরম বন্ধুকেও বিশ্বাস করতে ভয় করে। কাছের মানুষকেও শত্রুর চর বলে সন্দেহ করি। মা নিজের মেয়েকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। বাপ ছেলেকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। চাল নিয়ে হাহাকার পড়ে গেছে সারা রাজ্যময়। এক কণা চালের জন্যে বন্ধুতে বন্ধুতে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, আত্মীয়ে-আত্মীয়ে বিরোধ বেধে গেছে এই কলকাতা শহরে।

এ-সব বেশি দিনের ঘটনা নয়। এ-সব তোমাদেরও চোখে দেখা ঘটনা।

তখন সেই সব দিনে একা একা সাহেব-বৌদির বাড়িটার সামনে দিয়ে চলতে গেলে কেমন যেন হু হু করে উঠতো মনটা। দিন রাত বাড়িটা নিঝুম হয়ে থাকে। জানালা দরজা বন্ধ। সামনে লেটার-বক্সটা ফাঁকা, ভেতরে প্রাণ নেই। অলোকেশদা' থাকতে বাড়িটার রঙ করা হয়েছিল নতুন করে। সামনে লোহার গেট বসানো হয়েছিল। উর্দি পরা চাপরাশী, খানসামা, ঠাকুর, চাকর ছিল। সন্ধ্যেবেলা আলোয় আলো হয়ে থাকতো ঘরগুলো। নেটের পর্দা, রেডিওর গান, মটরের আর এ্যাটর্নী মক্কেলের আনাগোনা। তারপরে অলোকেশদা'র মৃত্যুর পরও কিছুদিন বাইরের জলুসটা বজায় ছিল। চাকর-বাকর কাউকেই ছাড়ায়নি সাহেব-বৌদি। কিন্তু সাহেব-বৌদির বৈধব্যের মত একদিন সমস্ত ম্রিয়মান হয়ে এল হঠাৎ। একদিন গাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। চাকর-বাকর আস্তে আস্তে বরখাস্ত হয়ে গেল। বাইরের দেয়ালে শ্যাওলা পড়ে ময়লা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরেও

যেন সব ফাঁকা সাদা হয়ে গেল। সাহেব-বৌদিও সাদা থানের মতই শূন্য।

এক একদিন দুপুরবেলা যখন গেছি, হয়ত দেখেছি সাহেব-বৌদি পুজো করছে। তারপর পুজো সেরে আমাকে দেখে হেসেছে। বলেছে —বোস দুষ্টু, গঙ্গাজলে হাতটা ধুয়ে আসি—

সাদা পাথরের থালায় ভাত খাবার সময় দূরে গিয়ে বসেছি।

সাহেব-বৌদি জিজ্ঞেস করেছে—তোর খাওয়া হয়েছে ?

আমি জিজ্ঞেস করেছি—তোমার খেতে এত দেরি যে ?

তারপর সেই অশৌচের মধ্যেই মামলা বেধেছে। রিক্‌শা নিয়ে সাহেব-বৌদি এ্যাটর্নী বাড়ি গিয়েছে।

আমি বলেছি—যখনই তোমার কোনও সাহায্য দরকার—আমাকে বোল সাহেব-বৌদি—

সেই অশৌচ অবস্থাতেই রোদে পুড়ে কত বেলা করে বাড়ি ফিরেছে। তার পর আবার বেরিয়েছে বিকেলবেলা। আগে যখন অলোকেশদা'র সঙ্গে গাড়িতে করে নিউ মার্কেটে বেড়াতে গিয়েছে, ময়দানে হাওয়া খেতে গিয়েছে, সে-চেহারাও দেখেছে এ-পাড়ার লোক। আবার আজ নিঃস্ব অবস্থায়, মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পর্দা ঢাকা রিক্‌শায় চড়া চেহারাও দেখলে! দেখে আমার মত তারাও অবাক্ হয়ে গেল। বিস্ময়ে, কৌতূহলে, বৈচিত্র্যে তারা যেন হতবাক্ হয়ে গেছে। যারা প্রথম-প্রথম অলোকেশদা'র মেম-বউ দেখে কটু মন্তব্য করেছিল, এতদিন দেখার পর সেই সাহেব-বৌদির ব্যক্তিত্বেই তারা যেন সত্যিই বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হয়ে গেছে। সাহেব-বৌদির সঙ্গে পাড়ার কোনও লোকের বাক্যালাপও নেই, অথচ যেন অসদ্ভাবও নেই। কেউ খোঁজ নিতে যেমন আসে না সাহেব-বৌদির খাওয়া জুটেছে কি না, তেমনি সাহেব-বৌদিও কাউকে সেধে গিয়ে নিজের দুর্দশার কথা জানায় নি।

অথচ যেদিন আমার কাছে প্রথম বলেছিল—কালকে কি খাওয়া

জুটবে তারও সংস্থান নেই—সেদিন আমার কাছে সাহায্য চাইবার আশায় কিন্তু তা বলেনি। শুধু আমার কাছে সব বলা চলতো বলেই বলেছিল।

দেখতাম সাহেব-বৌদির সেই নরম চেহারা কদিনেই কেমন ধীরে ধীরে কঠোর-কর্কশ হয়ে আসছে। দেখতাম শুধু চেহারায় নয়, আস্তে আস্তে পোশাকে পরিচ্ছদেও তার দারিদ্র্যের ছাপ পড়ছে। ছাপ পড়ছে চোখে, মুখে, শরীরের রেখায় সর্বত্র। বিধবা হবার পর গায়ের সমস্ত গয়না খুলে ফেলে বাক্সয় তুলে রেখেছিল। কিন্তু তারপর বাক্সে থেকেও যে আস্তে আস্তে চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তাও টের পেতাম।

একদিন আমাকেই হাতঘড়িটা দিয়েছিল। বলেছিল—এটা তুই নিস্—

আমি নিইনি। মনে আছে সেটা বেচে তিনশো টাকা এনে সাহেব বৌদির হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সাহেব-বৌদি রাগ করেনি, শুধু ম্লান হেসেছিল। আমি যে সব জানি, আমার কাছেও যে তার অবস্থার কথা গোপন নেই এটা ভেবেই হাসিটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

কিন্তু কোথায় যেন তবু তার মনের গোপনতম বিশেষ কথাটি আমাকে বলতো না কখনও সাহেব-বৌদি। আমার অভিমান ছিল সেখানেই।

তারপর মামলা চলতে লাগলো দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। হয়ত আরো কয়েক মাস কয়েক বছর সে-মামলা চলতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন সাহেব-বৌদির ব্যারিস্টার এজলাসে উঠে বললেন —আমার মক্কেল শ্রীমতী নোরা মিত্র মামলা চালাতে অক্ষম হওয়ায় বাড়ির স্বত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, তিনি আর প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধ চালাতে রাজী নন্—

আমরা ভাবলাম এবার বোধহয় শেষ পর্যন্ত বিলেতেই চলে যাবে সাহেব-বৌদি। কিন্তু তখনও তো আসল ঘটনাটা জানতাম না।

কেনও জানতাম না আবু রোডে এসে আবার দেখা হবে একদিন সাহেব-বৌদির সঙ্গেই। আর তখনও বিকানীরের ফতেগড়ের বড়ে মহারাজার সঙ্গে সাহেব-বৌদির কী সম্পর্ক তাও জানতাম না।

আর শুধু কি তাই! সাহেব-বৌদির কোনও যে ভাই বোন আছে তাই-ই জানতাম না। জানতাম না সাহেব-বৌদির সেজ-ভাইএর নাম উইলি। আর তখনও তো উইলির সঙ্গে দেখাই হয়নি আমার। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে কলকাতায় না এলে জানতেও পারতাম না সে সব।

কিন্তু তখন সাহেব-বৌদি নিরুদ্দেশ। চৌরঙ্গীর রাস্তায় চলতে চলতে অনেক বিচিত্র বিদেশী মুখ অনেক বিচিত্র বিদেশী পোশাক দেখতে দেখতে সাহেব-বৌদিকে তাদের মধ্যেই খুঁজেছি কতবার। আর অনেকদিন কোনও সংবাদ না পেয়ে মনে মনে ভেবেছি কোনও প্লেনে কিম্বা জাহাজের ডেকে আশ্রয় পেয়ে গিয়ে হয়ত শেষ পর্যন্ত দেশেই ফিরে গিয়েছে সাহেব-বৌদি। একদিন বিদেশী বাঙালীকে বিয়ে করে যে ভুল করেছিল সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আবার বড়লোক বাবা-মা'র কাছে ফিরেই গেছে। হয়ত আবার বরফ ঢাকা দেশের মাটিতে পা দিয়ে সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেছে তার।

এমনি সময় এমন এক জায়গায়, এমন এক পরিবেশে এমন এক পোশাকে দেখা হলো সাহেব-বৌদির সঙ্গে যে সত্যিই তা আমার কল্পনাতীত।

তখন আমাদের কলেজের মিশনারি এক প্রফেসরের চিঠি নিয়ে আমাকে স্ট্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে দেখা করতে হয়েছিল একজনের সঙ্গে। চাকরির জন্যে। এ-হোটেলে কখনও এর আগে আমার যাবার প্রয়োজন হয়নি। বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখেছি শুধু। সাদা চামড়ার পুরুষ মেয়ে আসছে যাচ্ছে। সামনে দিয়ে যেতে আসতে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসেছে। কেমন এক জাতীয় রোমাঞ্চ। ব্রিটিশ আমলে ওখানে ঢোকা ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। বিশেষ করে দেশী

ধুতি পাঞ্জাবি পরে। তখন সাদা চামড়ার রাজত্ব, তার ওপর যুদ্ধের সৌভাগ্য। হোটেলে তখন খাবার জুগিয়ে উঠতে পারে না মালিকরা। পঞ্চাশ হাজার টাকার মদ কিনে রাখলে রাতারাতি তিন লাখ টাকা লাভ। সোনা, টাকা, মদ, স্ত্রীলোক, সম্মান, মর্যাদা আর মৃত্যুর তখন ছড়াছড়ি। হাজার হাজার লোক কোন্ দূর দেশ থেকে কোন্ অজ্ঞাত কারণে জলপথ-বায়ুপথে এদেশ থেকে ওদেশে চলেছে। এখানে এসে দু'মিনিটের জন্যে ওঠে হোটেলে। হোটেলেও জায়গা পাওয়া দায়। কলকাতার সারা ময়দান ছেয়ে ছাউনি পড়েছে সৈন্যদের। তারাও দল বেঁধে আসে। এক মুহূর্তে উড়ে যায় সব। ধুলোর মত ঝড়ের মত উড়ে যায় মানুষের জীবন। এক ফুঁয়ে এক রাত্রে যৌবন নিঃশেষ হয়ে যায়। মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম পায়ের চাপে রাস্তার ধুলোয় মিশে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য, টাকার অভাব নেই কোথাও আর মদেরও অভাব নেই এই হোটেলের এই নিভৃত কোণে কোণে।

আর ঠিক এই সময়েই লেখাপড়া ছেড়ে চাকরির প্রয়োজনও আমার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

চাকরির অবশ্য অভাব ছিল না তখন কোথাও। কিন্তু পছন্দমত চাকরিরই অভাব ছিল আমার।

আর আশ্চর্য। এই হোটেলের এক মদের আড্ডাতেই আমার দেখা হয়ে গেল কিনা সাহেব-বৌদির সঙ্গে।

চৌরঙ্গীর রাস্তা থেকে হোটেলের গেট দিয়ে ঢুকে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি। শ্বেত পাথরের সজ্জা চারিদিকে। অসংখ্য লোকের আনাগোনা! কার্পেট পাতা মেঝের ওপর নরম পা ফেলে চলেছি। খানিক দূরে গিয়েই এক নতুন আবহাওয়া। এ-পাশে সিঁড়ি, ওপাশে কত ঘর, কত কৌচ সোফা, চারদিকে গলিপথ, কোথা দিয়ে গেলে কোথায় পৌঁছুব ঠিক নেই! মানুষের পৃথিবীতে যে জীবন-ক্ষয়ী যুদ্ধ বেধেছে, এখানে এই আবহাওয়ায় এসে তা যেন ভাবতে পারারও

উপায় নেই। এখানে ওখানে লাল রেক্সিনে মোড়া নিচু নিচু চেয়ার। সামনে নিচু নিচু টেবিল। পুরুষ আর মহিলারা দল বেঁধে গেলাসে চুমুক দেয়। মাঝে মাঝে খানসামাদের এদিক্ ওদিক্ ছুটে যাওয়া। চোখ চাইলেই নজরে পড়ে বোতল সাজানো ট্রে, পিঠ খোলা মেম-সাহেব, আর ডিনার স্যুট আর সিগারেট, আর সবার নাকে এসে ঠেকে সেই রহস্যময় মিষ্টি গন্ধের আমেজ!

নতুন আর প্রথম আসা আমার এখানে।

চারদিকে দেখে দেখেও যেন পেট ভরে না। পৃথিবীর এত সুন্দরীর এত একত্র-সমাবেশ আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়লো না। এত গাউন, এত লিপস্টিক, এত সোনালী চুল, এত সিগারেট—আর এত তাদের সমাদর। প্রত্যেক সুন্দরীকে ঘিরে লুব্ধ পুরুষের সমারোহ। সুন্দরীদের এক-একটা কটাক্ষে বিশ্বভুবনে প্রলয় ঘটে যাবার অবস্থা!

বেশিক্ষণ দেখতে কেমন যেন লজ্জা হলো। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ঠিকানা খোঁজ করে নিজের কাজ যথারীতি সেরে নিলাম। সামান্য একটা চিঠি দিতে হবে এক সাহেবকে। কিন্তু সাহেব তখন নেই ঘরে। চিঠি নিয়ে আবার ফিরে এলাম।

ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে আবার নিচে নামছি, কানে এল নিচেয় কাদের হাসির শব্দ।

ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে নিচেয় চেয়ে দেখলাম।

দেখি ঘরের এক কোণে এক সুন্দরীকে ঘিরে অনেক পুরুষের হুল্লোড় চলেছে, হাসি জমে উঠেছে, সিগারেটের ধোঁয়ায় জমাট হয়ে গেছে কাছের বাতাস।

আমি সেইদিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে দেখছি।

হঠাৎ যেন খেয়াল হলো, সব হাসি যেন আমাকে দেখে থেমে গেল, সব গান চুপ হয়ে গেল, সমস্ত কোলাহলও যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ!

আর আমার সামনেই তখন কার্পেটের ওপর পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে সাহেব-বৌদি !

আর তখন কি আমি চিনতেই পেরেছিলাম সাহেব-বৌদিকে !

মনে আছে—মাথার ছোট করে ছাঁটা চুলগুলোকে কুঁকড়ে সাজানো। চোখের পাতায়, ঠোঁটের রঙে, গালের টোলে, কানের দুল্-এ, আর নিচু-কাট পিঠ খোলা গাউনে আগুনের শিখার মত আমার কাছে যে সেদিন এগিয়ে এসেছিল সে-ই যে সাহেব-বৌদি তা কেমন করে ধারণা করবো।

সাহেব-বৌদি লিফটে উঠে কোথা দিয়ে আবার কোথায় কোন্ তলায় আমাকে নিয়ে গেল তা বুঝতে পারলুম না। এতক্ষণ কথা বলার সম্বিতটুকুও যেন ছিল না আমার।

নিরিবিলি একটা জায়গায় বসতেই বললাম—সাহেব-বৌদি—

সাহেব-বৌদি বললে—আমাকে চিনতে পেরেছিস্ তুই ?

আমি আর অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারলুম না।

সাহেব-বৌদি বললে—এখানে তুই কী করতে ?

যে প্রশ্ন করার কথা আমার, সেই প্রশ্নই সাহেব-বৌদি করলে।

বললাম—তোমাকে এখানে দেখতে পাবো, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি সাহেব-বৌদি—

সত্যি সাহেব-বৌদির খালি বাড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিন কত রকম উদ্ভট কল্পনা করেছি। কতদিন ভেবেছি সাহেব-বৌদি হয়ত বিলেতে চলে গেছে, কিম্বা কোথাও আত্মগোপন করে নিজের দুঃখের বোঝায় নিজেই ক্লান্ত হয়ে একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। কিম্বা হয়ত নিজের হাতে নিজেরই চূড়ান্ত অপমান করে সব অপমান সব দুঃখের শেষ করে দিয়েছে। অথবা হয়ত সব অপমানের শোধ নিয়েছে নিজের ওপর চরম আঘাত দিয়ে।

এ-সব কল্পনার সঙ্গে সেদিনের বাস্তবের যখন কিছুই মেলেনি তখন সত্যিই আমার চরম অবাক্ হওয়ার পালা। সাহেব-বৌদির দিকে চেয়েও যেন চিনতে পারলাম না সাহেব-বৌদিকে!

বললাম—তোমার এ কী হ'ল সাহেব-বৌদি?

সাহেব-বৌদি বললে—কী হয়েছে আমার বল্ তো?

সাহেব বৌদির সেই প্রশান্ত চেহারার সঙ্গে এ-চেহারার যে কোনও মিল নেই, সে-কথাও কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে! কোথায় গেল সেই সিঁদুর? সেই আলতা, টিপ, শাড়ি, সেই পুজো, সেই সাদা থান, সেই একাদশী, বৈধব্য, সেই পবিত্র জীবন-ধারণ! আজ রুজ পাউডার লিপস্টিকেই শুধু নয়, আজকের এই কুৎসিত হাসি, লাস্য, কটাক্ষ, এই অশ্লীল পোশাক আর ভেতরের এই কুৎসিত আবহাওয়াতেও যেন সেদিনকার সাহেব-বৌদিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

বললাম—তুমি কি সত্যিই আমার সেই সাহেব-বৌদি? আমি যে চিনতে পারছি না।

সাহেব-বৌদি হাসতে লাগলো। বললে—তোর এত বয়েস হলো, তবু তুই এই কথা বলছিস্?

বললাম—সাহেব-বৌদি, তোমাকে যে আমি ভালবাসতুম।

সাহেব-বৌদি আবার হাসলে। বলতে লাগলো—তুই ভুল করেছিস দুষ্টু—আমাকে তুই ভুলে যা ভাই—

বললাম—কিন্তু কেন এমন হ'ল?

সাহেব-বৌদি বললে—এ্যাক্সিডেণ্ট—আর কিছু নয়—

বললাম—মিথ্যে কথা, তুমি যে-দেশের মেয়ে তাদের উপযুক্ত কাজই করেছ—তোমাকে বিশ্বাস করে ভুল করেছিলুম সাহেব-বৌদি, অলোকেশদা'র মুখেও চুনকালি লাগাতে তোমার বাধলো না তুমি এমনই নীচ, এমনই স্বার্থপর?

সাহেব-বৌদি চুপ করে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

তারপর কী জানি মনে হ'ল—ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে এক দৌড়ে পালিয়ে এলাম সেখান থেকে। মনে হ'ল সাহেব-বৌদি বোধহয় আমাকে বাধা দেবে, পেছন থেকে একবার ডাকবে। অন্তত নিজের অসহায় অবস্থার কথাটা বোঝাবারও চেষ্টা করবে একবার। কোন্ অবস্থায় পড়ে কেমন করে এই লজ্জাকর জীবন যাপন করতে বাধ্য হ'য়েছে তা খুলে বলবে। মানুষের অপমানিত আত্মার কেমন করে অপমৃত্যু হয় তা-ও জানাবে! কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। সাহেব-বৌদিকে চিনতে আমার ভুলই হয়েছিল সেদিন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চারিদিকের সেই বিলাস সেই ঐশ্বর্যের ফাঁকা আতিশয্যের মধ্যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন আর্তনাদ করে উঠতে চাইলো। সেই মদ, সেই বিভ্রম, সেই হৈ হল্লা, সেই সভ্যতার কলঙ্কের রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে সাহেব বৌদির কথাটাই আমার বুকে বার বার বড় করে বাজতে লাগলো। কেমন করে সাহেব-বৌদি ওখানে থাকবে। রাতের পর রাত কেমন করে কাটাবে ওখানে! অন্য কোনও গতি ছিল না কি তার!

কতকগুলো মিলিটারি সৈন্য তখন হল্লা করতে করতে ঢুকছে হোটেলের গেট দিয়ে। আমি তাদের পাশ কাটিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। ভয় করতে লাগলো—ওরা হয়ত সাহেব বৌদির ওপর অত্যাচার করবে! সাহেব-বৌদিকে অপমান করবে। দু'টুকরো রুটির জন্যে সাহেব-বৌদি হয়ত ওদের অপমান হাসি মুখে পিঠ পেতে সহ্য করবে!

ভাবতে গা-টা যেন শিউরে উঠলো ভয়ে!

তারপর বাড়ি ফিরে এসেও কি শান্তি ছিল মনে! প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা হোটেলের বাইরে উল্টোদিকের ফুটপাতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে দেখেছি হোটেলটার দিকে। ভেতরের সেই গন্ধ একটু একটু ভেসে আসতো নাকে! ভেতরের আরো কিছু কিছু ঠিকরে এসে পড়তো বাইরে। বাইরের পৃথিবীতে যখন দুর্ভিক্ষ আর অগণিত

আর্ত মানুষের হাহাকার সমস্ত শহরের আবহাওয়া পঙ্কিল করে তুলেছে, তখন ভেতর থেকে নাচের আর গানের আর বাদ্যের আর মদের গন্ধ বাইরে ভেসে এসেছে। টাকার ঝনঝনানি আর রূপের ঝলসানিতে কত আকাশ-চুম্বী কল্পনা মেঝের কার্পেটের ওপর গুঁড়িয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। কত জীবনের গৌরীশৃঙ্গ পদদলিত হয়েছে, কত নিষ্পাপ কামনা অবমানিত হয়েছে, ইতিহাসে তা লেখা নেই। দলের পর দল ঢুকেছে হোটেলের গেট দিয়ে, যখন বেরিয়েছে তখন ভেতরে কত হতাশার দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে ইথারে মিলিয়ে নারীত্বের গৌরব লাঞ্ছিত করে দিয়ে বেরিয়েছে, তার হিসেব নিকেশ তারা রাখতে চায়নি। কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে মালয়, মালয় থেকে ফিলিপাইন—কোথাও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র!

আমি শুধু সেই সব দিনের নিঃশব্দ সাক্ষী হয়ে একলা দাঁড়িয়ে থেকেছি চৌরঙ্গীর নির্জন ফুটপাথটার এককোণে একটা অল্পান্ধকার গ্যাস পোস্টের নিচে। তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখেছি প্রত্যেকটি সুন্দরীর মুখের দিকে। সাহেব-বৌদির সাদৃশ্য যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। যদি একটি মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্যেও সাহেব-বৌদিকে দেখা যেত! সাহেব-বৌদির কলঙ্কের সাক্ষী থাকবার জন্যে নয়, সাহেব-বৌদিকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেও নয়। একদিন সাহেব-বৌ-দিকে ভালোবেসেছিলাম, বোধহয় তার প্রভাব তখনও কাটেনি। তাই সেই প্রভাবের তাড়নায় তাকে একবার শুধু দেখবার প্রয়োজনেই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

একদিন সত্যি সত্যিই সুযোগ মিলে গেল।

রাত তখন অনেক হয়েছে। অনেকদিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও কিছুতে দেখা না পাওয়াতে আস্তে আস্তে হোটেলের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। মনে হ'ল—যেন অপমৃত্যুর গহ্বরে ঢুকছি। দু'-

পাশের সেই শো-কেস, পায়ের তলায় সেই কার্পেট মাড়িয়ে অনেক ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গেলাম। সেই পরিচিত গন্ধ, সেই অপরিসর পরিবেশ। সেই পিঠ খোলা ফরসা শরীরের সমারোহ চারিদিকে। সেই বিলিয়ার্ড টেবিল্, সেই মদের কাউন্টার। আর সকলের শেষে সিঁড়ির তলায় সেই লাল-রেক্সিনের কৌচ সোফা। নিচু নিচু টেবিলের ওপর বোতল, গ্লাস, ডিকেণ্টার!

আমার চোখ ছুটো ঘুরে ফিরে কেবল একটি মানুষেরই একজোড়া কালো চোখ খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

হঠাৎ দেখলাম সাহেব-বৌদিকে!

উদ্দাম, উত্তাল হয়ে বহু-পুরুষের ভিড়ে যে মেয়েটি সকলকে উন্মত্ত করে তুলেছে, সে-ই যে সেদিনকার সাহেব-বৌদি, তা আর আমাকে বলে দিতে হ'ল না।

কিন্তু একবার মনে হ'ল কেন এলাম এখানে! ফিরে যাই। চারিদিকের অর্কেষ্ট্রার শব্দ যেন গুঞ্জন ধ্বনির মত নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়ে সমস্ত আবহাওয়াকে নেশাগ্রস্ত করে দিতে চায়। যে এখানে আসবে সে যেন তার সুস্থ চেতনা হারিয়ে ফেলে। লজ্জা সম্ভ্রম পবিত্রতা সমস্ত যেন সে গেটের বাইরে পরিত্যাগ করে নিরাবরণ হয়ে এখানে ঢোকে। সমস্ত সম্মান, শালীনতা বিসর্জন দিয়ে তবে এখানে সে প্রবেশাধিকার পায়।

তবু সাহেব-বৌদি আমাকে দেখতে পেলে না।

দেখলাম সাহেব-বৌদি হাতের পেগটা উঁচু করে ধরে কী যেন বলছে! তারপর লম্বা একটা সিগারেটের পাইপ মুখে দিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর হুড়মুড় করে সবাই এসে জড়ো হ'ল সাহেব-বৌদির সামনে। সাহেব-বৌদির পিঠের দিকের সমস্তটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পিঠের ভাঁজগুলো প্রত্যক্ষ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। প্রতিটি রোমকূপের কোষে কোষে যেন নেশার অবসাদ আর উত্তেজনার শিহরণ কাঁপছে! পাতলা সিল্কের সামান্য আবরণ ভেদ

করে সাহেব-বৌদির সমস্ত উচ্ছ্বাস যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ধমনীর রক্ত চলাচল যেন দ্বিগুণ বেগে ছুটতে শুরু করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রলয় ঘটিয়ে দিলে প্রতিটি পুরুষের রক্ত-প্রবাহে! চঞ্চল হয়ে উঠলো মানুষ, অর্থ, বিলাস, বৈভব, সম্মান, সম্ভ্রম—সমস্ত। সাহেব-বৌদির ইঙ্গিতে যেন মানুষের মনুষ্যত্বের মুখোস উন্মুক্ত হয়ে গেল।

আর দেখতে ইচ্ছে হ'ল না। কাছে গিয়ে ডাকলাম—সাহেব-বৌদি—

সমস্ত জনতা যেন অবাক্ হয়ে গিয়েছে। অবাক্ সাহেব-বৌদিও কম হয়নি। হঠাৎ আমাকে দেখে পাশ থেকে একটা নেটের ওড়না টেনে নিয়ে নিজের শরীরটাকে ঢেকে ফেললে। তারপর তাড়াতাড়ি আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে সেদিনকার মত বাইরে নিয়ে এল।

বললাম—আবার এলুম সাহেব-বৌদি—

সাহেব-বৌদি হাসতে লাগলো। বললে—আমি জানতুম তুই আসবি—

বললাম—না এসে আর পারলুম না যে—

সাহেব-বৌদি বললে—একটা রিক্‌শা ডেকে নিয়ে আয় তো—

রিক্‌শা!

সাহেব-বৌদি বললে—তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল—

মনে আছে সেদিন সাহেব-বৌদির সঙ্গে সেই যে এক রিক্‌শায় বেরিয়েছিলাম, সে কিছু কথা শোনার লোভে নয়। বহুদিন পরে সাহেব-বৌদির পাশে বসতে পারবো সেই লোভের আকর্ষণও কম ছিল না। সেই হোটেল থেকে সাহেব-বৌদিকে আমার পাশে দেখে সেদিন অবাক্ যদি কেউ হয়ে থাকে, তবে তারা আরো অবাক্ হয়ে গিয়েছিল সাহেব-বৌদিকে নিয়ে এক রিক্‌শায় উঠতে দেখে।

হোটেলের সেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ছাড়িয়ে রিক্‌শা ঢুকলো

পাশের রাস্তায়। তারপর সে রাস্তা পেরিয়ে যে-গলি পথ ধরলো সেখানে দিন-দুপুরেও চলতে ভয় করে।

বললাম—এ কোথায় চলেছ সাহেব-বৌদি?

সাহেব-বৌদি কোন কথা বললে না। সাহেব-বৌদির পাশে বসেও মনে হলো যাকে এতক্ষণ হোটেলের ভেতরে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় দেখেছি সে যেন এ নয়! পাশে বসে গায়ের সেন্টের গন্ধ মুখে মদের গন্ধ পাচ্ছি। নেটের জাল ঘেরা সিল্কের গাউনে মোড়া শরীরটার ভেতরে যেন সেই আগেকার সাহেব বৌদিকে খুঁজতে লাগলাম। একবার মনে হলো যেন চিনতে পারছি, আবার মুখের দিকে চেয়ে যেন মনে হলো এ আমার অচেনা। যদি আগে কোনও-দিন একে চিনেছি বলে গর্ব থেকে থাকে তো সে আমার ভুল ধারণা। আমার মানুষ চেনবার ক্ষমতা নেই—আমার গল্প লেখার চেষ্টা বাতুলতা। অনেক গলি পেরিয়ে যে-রাস্তা দিয়ে রিক্‌শা চললো সে বড় কদর্য গলি। চারিদিকে নোংরা বস্তি। লুঙ্গি পরা লোকজন একটা ময়লা অপরিষ্কার হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। রাস্তায় বেঞ্চি পেতে বসে হুঁকো খাচ্ছে, চা খাচ্ছে। রুটি মাংস খাচ্ছে এনামেলের থালায়। কুকুরগুলো সামনে হাঁ করে চেয়ে আছে। যদি একটা টুকরো ছুঁড়ে দেয় কেউ। চারিদিকে জটলা। যেন এখানে সন্ধ্যে হলো এই মাত্র। লাল নীল কাগজের ফুলে সাজানো কয়েকটা দোকান। ইদ্ কি রমজানের সময় সাজাতে হয়েছিল, আর খোলা হয়ে ওঠেনি। মাংস আর গরম মসলার গন্ধ চারিদিকে। নোংরায় ভন্ ভন্ করছে সমস্ত জায়গাটা। এও যে কলকাতার একটা অঞ্চল এ-কথা আমারও বিশ্বাস করতে যেন ইচ্ছে হলো না। চৌরঙ্গীর সেই অভিজাত আবহাওয়ার পেছনেই এ যেন বিরাট এক অস্বস্তিকর প্রতিবাদের মত মনে হলো আমার কাছে।

সাহেব-বৌদি আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ। গলায় মুক্তোর মালাটা চিক্ চিক্ করে উঠছে, হাতে হীরের চুড়ি, গায়ে দামী

সিল্কের গাউন, আর পায়ের লাল রঙ করা আঙুলগুলো সোনালী জুতোর ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করে বসে আছে। আমি একমনে তাই দেখছিলাম।

মনে আছে একটা বাড়ির কাছে গিয়ে রিক্‌শাটা থামলো।

সাহেব-বৌদি নেমে বললে—আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়—

সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলাম। নড়বড়ে বাড়ি একটা। অসংখ্য তার পথ, অসংখ্য তার ঘর। কয়েকটা মুর্গি বুঝি উঠোনে জাল-ঘেরা রয়েছে। মানুষের শব্দে একবার কিচকিচ শব্দ করে উঠলো। চটা ওঠা উঠোন। টবে কয়েকটা পাতাবাহার গাছ। ভাঙা ডিমের খোলা পায়ের চাপে কড়মড় শব্দ করে উঠলো। সামনের ঘরেব ভেতরে অনিন্দ্য সাজে কয়েকজন মেম-সাহেব সেজে-গুজে বসে পাইপ দিয়ে সিগারেট টানছে। কয়েকজন লুঙ্গিপরা লোক বাড়ির মধ্যে আসা-যাওয়া করছে। সদর-অন্দরের কোনও বালাই নেই কোথাও। তবু পর্দা, গাউন, পার্টিশনের অভাব নেই কোথাও।

পাশেই একটা কাঠের সিঁড়ি। সাহেব-বৌদি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়ির কার্পেট ছিঁড়ে ময়লা-অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। দেয়ালের ডিস্‌টেম্পারে নানা দাগ। কাচের কেস-এ লাল-নীল মাছ। সিঁড়ির বাঁকের মুখেই দেয়ালে আঁটা একটা আয়না। তারের খাঁচায় ক্যানারী পাখীর ঝাঁক। সাহেব-বৌদির মুখটার ছায়া আয়নাতে পড়তেই তার পাশে আমার মূর্তিটাও ভেসে উঠলো। নিজের মুখের চেহারাটা দেখে বুঝতে পারলাম কৌতূহলে ভয়ে একেবারে শুকিয়ে উঠেছি আমি।

বললাম—এ কোথায় নিয়ে এলে সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি বললে—ভয় নেই তোর, আমি তো আছি—

সাহেব-বৌদির কথাতে যেন আশ্বস্ত হলাম। তারপর ছোট গলি-পথ দিয়ে একটা অন্ধকার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চাবি খুলে বললে—আয়—এখানে আমি থাকি, আমার ঘর এটা—

আজ এত দিন পরে এত বছর পরে সেদিনকার কথাগুলো ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ হয়। কলকাতার যে-সমাজে আমি মানুষ সেখানে বাস করে এ-পরিবেশ দেখবার সুযোগ সুবিধে বড় একটা ঘটে না আমাদের। আমরা ছোটবেলায় স্কুলে যাই, স্কুল থেকে যাই খেলার মাঠে, তারপর পড়তে বসা। প্রত্যেকটি দিনের এই হ'ল ইতিহাস। বড় জোর দু'একদিন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বিয়ে-শ্রাদ্ধ এইরকম অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে যা কিছু অভিজ্ঞতা হয়। বন্ধু-বান্ধব বলতে সবই স্কুল আর খেলার মাঠের সীমানার মধ্যে গণ্ডী বাঁধা। আর পাশের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকেই প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বুঝি তাই পাই। পৃথিবীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছ থেকেই আসে। মাঝে মাঝে যদি কখনও বিদেশে বেড়াতে গেছি তো সে বাপ মায়ের শাসন দিয়ে ঘিরে। যা দেখি তাঁদের চোখ দিয়েই দেখি, যা শিখি তাঁদের মন দিয়েই শিখি। তা এড়িয়ে ভাবতে আমরা শিখি না, ভাবতে শিক্ষাও দেওয়া হয় না। তা ভাবা আমাদের সমাজে অপরাধ।

কিন্তু আমার নিজের ব্যাপার একটু আলাদা। কখনও গুরু-জনদের কথা শুনলুম না, কখনও পরের চোখ দিয়ে দেখাকে নিজের দেখা বলে ভুলও করিনি। লাজুক বলে নিজের মনের অলিগলিতে নিজেই হাতড়ে বেড়িয়েছি। সব জিনিসের মানে করেছি নিজের মনের মত করে। আর ঘটনাচক্রে অনেক অদ্ভুত চরিত্রের ছেলে আর মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশবার সুযোগ পেয়েছি, তারা প্রাণ খুলে আমার সঙ্গে মিশেছে, কেউ কেউ আমাকে তাদের মনও দিয়েছে। তাদের সুখে সুখ পেয়েছি নিজে, তাদের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছি নিজের বুক।

এই কেমন সাহেব-বৌদি! সাহেব-বৌদি আমাকে সেদিন সঙ্গে করে সেখানে না নিয়ে গেলে কি আমিই কোনও দিন যেতুম। কে জানতে পারতো কলকাতাতেই অমন একটা জায়গা আছে। কে

জানতো কলকাতা শহরের মধ্যে চারটাকা ভাড়ায় ঘর পাওয়া যায়। কে জানতো হীরের চুড়ি, মুক্তোর মালা, সিল্কের গাউন, সোনালী চামড়ার জুতো, খাবার থালা, সব কিছু দৈনিক রেটে ভাড়া পাওয়া যায়। যাত্রা থিয়েটারের পোশাক-আশাক ভাড়া পাওয়ার কথা শুনে এসেছি। বিয়ের আসরে চেয়ার, টেবিল, শামিয়ানা, তাকিয়া, হুঁকো ডিশ, কাপ ভাড়া পাওয়া যায় তা-ও জানতাম! কিন্তু ·

সাহেব-বৌদি বললে—তুই একটু বোস ভুষ্টু, আমি আসছি এখুনি—

আমার ভয় হতে লাগলো। বললাম—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

সাহেব-বৌদি বললে—এখুনি আসছি, তোর-কোনও ভয় নেই—বলে তর তর করে বেরিয়ে গেল সাহেব-বৌদি অন্ধকারের মধ্যেই।

আমি চুপ করে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। একটা ভাঙা খাটের ওপর বসে আছি। ছেঁড়া চাদরের ওপব কিছু ময়লা জামা কাপড়। সাহেব-বৌদির এত ময়লা পোশাক আমি ভাবতে পারিনি। হয়ত ধোপার বাড়ি দেওয়া হয়নি সময়ের অভাবে। বাইরে কোথায় উঠোনে ক'একটা হাঁস ডেকে উঠলো। নিচের রাস্তায় গোলমাল উঠলো কিছুক্ষণের জন্যে। অনেক লোকের চীৎকার। এখানেও মাংসর গন্ধ নাকে আসছে। হঠাৎ পায়ের কাছে একটা ধাড়ি ইঁদুর আমাকে দেখেই আবার দরজাব দিকে পালিয়ে গেল। আমি চমকে উঠেছি আচমকা।

ওপাশের ঘরে গ্রামোফোন বেজে উঠেছে। কয়েকজন মেম-সাহেবের গলা।

কিছু হাসি-ঠাট্টার টুকরো আর সস্তা সিগারেটের ধোঁয়া।

হঠাৎ আবার কাঠের সিঁড়িতে দুপ-দাপ আওয়াজ হলো।

ঘরে ঢুকলো সাহেব-বৌদি। হাতে করে যেন কী এনেছে।

কিন্তু চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। বললাম—এ কি?

সাহেব-বৌদি বললে—আজ কিছু খাওয়া হয়নি—তোর জন্যেও এনেছি—

দেখলাম কাগজে মোড়া অনেকখানি ডিমভাজা আর মগে করে দু'জনের চা।

বললাম—কিন্তু তোমার সেই সিল্কের গাউন?

সাহেব-বৌদি বললে—দোকানের জিনিস দোকানেই দিয়ে এলুম—

বললাম—দোকানের জিনিস?

সাহেব-বৌদি বললে—ওই গয়না জুতো আর গাউনের ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা রোজ—হাতে নগদ টাকা ছিল না, বললাম, কাল দাম দেব—এখন তো চেনা হয়ে গেছে, ধারে দেয়—

আমার মুখ দিয়ে যেন কোনও কথা বার হবার নেই। আমি অবাক্ হয়ে দেখছি সাহেব-বৌদির দিকে চেয়ে! ময়লা গাউন আর পায়ে একজোড়া চটি। গলার হার, হাতের চুড়ি কিছু নেই।

সাহেব-বৌদি আমার মগে চা ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলো—একদিন গাড়ি ছিল নিজের, বাড়ি ছিল নিজের, সে কথা এখানকার কেউ বিশ্বাস করে না, জানিস্—অলক আমার হাতে হাজার-হাজার টাকা এনে তুলে দিয়েছে, ভেবেছিলাম জীবনটায় বুঝি এবার শান্তি এল, ভেবেছিলাম আমার সেই ডোরার সঙ্গে বাজি রাখা বুঝি সার্থক হলো—

তারপর বললে—আমার এখানে কিন্তু আমি আর এঁটো মানি না, একাদশী পূর্ণিমে মানি না—আমি বিধবা সে-কথা কিন্তু আর মনে নেই, জানিস্—

আবার বললে—আমি গোবর দিয়ে এঁটোও পাড়ি না, গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় প্রণামও করি না—আমি সে-জীবন একেবারে ভুলে গেছি—জানিস্—

আমার মুখের দিকে ভালো করে না-তাকিয়েই আবার বলতে লাগলো—আমি জানতুম তুই আবার আসবি ছুট্টু—কিন্তু কেন এলি তুই?

তারপর মগের চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—ওখানকার সবাই জানে আমি ছ'মাস হলো ওয়েলস্ থেকে এসেছি—আমার জন্যে হোটেলের খদ্দের বেড়ে গেছে, একদিন মদ খেয়ে সবাই মারামারিও করেছিল আমাকে নিয়ে—সুলতানগঞ্জের প্রিন্স···

বললাম—আমার কাছে ও সব গল্প করতে তোমার লজ্জা করছে না ?

সাহেব-বৌদি হেসে উঠলো সেই আগেকার মিষ্টি হাসি !

বললে—লজ্জা করবে কেন ? যখন একত্রিশ টাকা ছ' আনা সম্বল করে নিজের বাড়ি ছেড়ে পাড়া ছেড়ে এখানে এসেছিলাম, সেদিন আমার লজ্জা বাঁচাতে কেউ এগিয়ে এসেছিল যে আজ লজ্জা করবে ?

তারপর মগে আর এক চুমুক দিয়ে বললে—আমি না হয় মেম-সাহেব কিন্তু অলকের বউ তো, আমার বাড়ি যখন জোর করে আত্মীয়রা কেড়ে নিলে তখন আমি কেমন করে কোথায় থাকবো কেউ এসে জিজ্ঞেস করেছিল ?

তারপর আবার বলতে লাগলো—আমি মেম-সাহেব হতে পারি কিন্তু মেয়েমানুষ তো—আমার কি ইজ্জত নেই, আমার কি লজ্জা নেই, সম্ভ্রম নেই, আব্রু নেই—?

সাহেব-বৌদি আবার হেসে উঠলো। বললে—তাই তো তোকে এখানে নিয়ে এলুম—তুই দেখে যা, যাদের তোরা ছোটলোক বলিস্ তারা কিন্তু সেই দুরবস্থার সময়ে আমায় আশ্রয় দিয়েছে। আমাকে ধারে জিনিসপত্তর দিয়েছে, এ-পাড়ার বড় গুণ্ডা আবদুল মিয়া আমাকে অভয় দিয়েছে, জামা কাপড় ভাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে—তোরা কেউ যা করিস্ নি—

তারপর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললে—আমার এখানে খেতে তোর ঘেন্না করছে বুঝি ?

তবু কিছু কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোল না।

সাহেব-বৌদি বললে—তা হলে না খাস্ তো ফেলে দিই—বলে

খাবারের ডিস্‌টা নিয়ে জানালার কাছে যেতেই উঠে সাহেব-বৌদির হাতটা চেপে ধরেছি।

বললাম—আমার জন্যে তোমার মায়া হয় না সাহেব-বৌদি? তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, ফেলে দিও না—

সাহেব-বৌদি বললে—আমার জন্যেই কি কারো মায়া হয়েছে কখনও? বলে আবার বসলো বিছানায় এসে।

বললে—নিজের চোখেই তো দেখে এলি হোটেলের বারে এতক্ষণ কী করছিলুম, মিথ্যে কথা বলবো তোর কাছে সে-উপায় নেই! কিন্তু আমারও তো পেট চালাতে হবে, আমারও তো ঘরভাড়া দিতে হবে, চাল ডাল কেনবার পয়সা উপায় করতে হবে—রাত্রের খাওয়াটা তো ওদের খরচে হয়, কিন্তু সকালবেলা? সকালবেলা কিছু তো খেতে হবে!

বললাম—কে তোমার কাছে এত কৈফিয়ত চেয়েছে সাহেব-বৌদি?

সাহেব-বৌদি সে-কথা যেন শুনতে পেলে না। বললে—এ পাড়ায় এই আবদুল মিয়ার গুণ্ডার দল আছে বলে তবু বেঁচে আছি, কিন্তু একে কি বাঁচা বলে?

বললাম—আচ্ছা, বিলেতে ফিরে যেতে তোমার কত টাকা জাহাজ ভাড়া লাগে!

সাহেব-বৌদি আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে—তুই টাকা দিবি আমাকে? তোর বুঝি অনেক টাকা হয়েছে?

বললাম—আমার সোনার বোতাম ঘড়ি সব বেচে তোমায় আমি টাকা জোগাড় করে দেব—তুমি চলে যাও—অন্তত তিনশো টাকা হবে ওগুলো বেচলে—

সাহেব-বৌদি বললে—ও টাকা তো আমার একদিনের একরাতের উপায়, তা জানিস্?

মুখ তুলে ভালো করে চাইলাম সাহেব-বৌদির দিকে!

সাহেব-বৌদি বললে—এক রাতে আমার তিনশো টাকা আয়—

মাঝে মাঝে তেমন রাজা-মহারাজা জুটে গেলে হাজার টাকাও হয়ে যায় —কিন্তু তাতেও আমার কুলোবে না, মাসে অনেক টাকা আমার খরচ—দিনে সাড়ে পাঁচ টাকার গাউন ভাড়ায় আমার তিন চারশ এলে কি চলে ?

মনে হলো সাহেব-বৌদি যেন মদ খেয়ে মাতলামি করছে। এতক্ষণে সন্দেহ হলো সত্যিই মাতালের সঙ্গে কথা বলছি। সাহেব-বৌদি যা বলছে তার কোন অর্থ নেই। ভালো করে চেয়ে দেখলাম —রাত জেগে জেগে সাহেব-বৌদির চোখে কালি পড়েছে, গলার কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। ছোট গাউনের তলায় ফরসা পা জোড়া যেন কর্কশ দেখাচ্ছে এখন্। আগে যেন অনেক লালিত্য ছিল শরীরে।

সাহেব বৌদি বললে—রাত হয়ে যাচ্ছে—তুই এবার বাড়ি যা।

কি জানি কেন যেন আঘাত দিতে ইচ্ছে হলো। বললাম—হ্যাঁ, আমি থাকলে তোমার ব্যবসার ক্ষতিই হবে বৈকি !

সাহেব-বৌদি হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাব মুখে এক চড বসিয়ে দিয়েছে।

এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু কিছুই বললাম না মুখে।

সাহেব-বৌদি চীৎকার করে উঠেলো ! হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—তোর এত বড় সাহস, তোর মুখে আটকালো না ও-কথা বলতে ?

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। কিন্তু মুখ মিচু করেই বললাম—আমাকে চড় মারলে তোমার কলঙ্ক মুছবে মনে কোর না—

সাহেব-বৌদির গলা আরো চড়ে উঠলো। বললে—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—?

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললাম—তোমার ওপর আমার বড় শ্রদ্ধা ছিল কিনা—তাই তুমি এমন কবে বলতে পারো।

সাহেব-বৌদি রাগে তখনও কাঁপছে। বললে—বেরিয়ে যা তুই—বেরিয়ে যা এখুনি আমার ঘর থেকে—

আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম দরজার দিকে। সাহেব-বৌদি ডাকলে—শোন্—

বলে এগিয়ে এসে বললে—তোর বয়েস কত ?

রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। বললাম—মদ খেয়ে মাতাল না হলে বুঝতে পারতে তোমার সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় শুয়ে রাত কাটাবার বয়েস আমার নেই আর—

বলেই তাড়াতাড়ি চলে আসছিলাম। কিন্তু কী যে দুর্বলতা হ'ল, পেছন ফিরে দেখলাম সাহেব-বৌদি বিছানাব ওপর মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। দরজার বাইরে থেকে সেই দিকে চেয়ে আমার চোখেও যেন জল আসতে চাইল। পেছন থেকে সেই ময়লা গাউন পরা শরীরটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল যেন সাহেব-বৌদি অনেক রাতে ঘুমোতে পায় না, অনেক রাতে যেন খেতেও পায় না পেট ভরে। পিঠের দিকের শিরদাঁড়াটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে পাতলা ময়লা গাউনটার ওপর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করণীয় ভাবছি। হঠাৎ লুঙ্গি পরা একটা লোক কাঠের সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে আমাকে দেখে যেন থমকে দাঁড়াল একটু। আমার পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে একবার চেয়েও দেখলে। তারপর কী জানি কী ভেবে সাহেব-বৌদির খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সাহেব বৌদিকে ওই অবস্থায় দেখে যেন কী ভাবলে একবার। তারপর সন্তর্পণে ডাকলে—মিসি-মায়ি—

সাহেব-বৌদির কান্না থামলো। কিন্তু তখনও পেছন ফিরে তাকাল না।

লোকটা আবার ডাকলো—মিসি-মায়ি, সুলতানগঞ্জের ছোট কুমার সাহেব এসেছে—

সাহেব-বৌদি এবার উঠলো। উঠে চোখ দুটো আড়ালে মুছে নিয়ে দরজার দিকে মুখোমুখি এগিয়ে এল। বললে—কে, ইউসুফ এসেছিস্ ?

ইউসুফ বললে—সুলতানগঞ্জের ছোটকুমার সাহেব হাওয়া-গাড়ি নিয়ে এসেছে, নিচেয় দাঁড়িয়ে আছে—

সাহেব বৌদি আমার দিকে চাইল একবার। আমি তখনও তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এবার সাহেব-বৌদি যেতে বললেও যাবো না।

সাহেব-বৌদি বললে—তুই বল কুমার সাহেবকে, আজ তবিয়ত খারাপ আছে আমার—

ইউসুফ বললে—বহুৎ বড়ে আদমী মিসি-মায়ি, যদি গোসা করে—?

সাহেব-বৌদি বললে—আমি বলছি ইউসুফ, যা বলছি তাই বলগে যা—

ইউসুফ বললে—হোটেলে গিয়ে আপনার খোঁজ পাইনি, তাই তো এখানে ডেকে এনেছি—কুমার সাহেব নতুন গাড়ি কিনেছে—

সাহেব-বৌদি কী যেন ভাবলে একবার। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—রাত হয়ে গেল, তুই বাড়ি যাবি না?

আমি তখন স্থির দৃষ্টি দিয়ে সাহেব-বৌদির দিকে দেখছি। বললাম—না—

সাহেব-বৌদি যেন অবাক্ হলো উত্তর শুনে। বললে—যাবি না?

আবার বললাম—না—

সাহেব-বৌদি বললে—আমার টাকার ক্ষতি করে কোন লাভ আছে তোর?

বললাম—তোমার যা টাকা লাগে আমি দেব, আমার ঘড়ি, সোনার বোতাম আমার জন্ম-দিনে পাওয়া চল্লিশটা টাকা, তিনটে মোহর, পাঁচটা আংটি—সব দেব—

ইউসুফ উসখুস করতে লাগলো। বললে—কেন বাবু ঝামেলা বাড়াচ্ছেন, সুলতানগঞ্জের ছোট কুমারসাহেব হাজার হাজার রূপেয়া

মিসি-মায়ির জন্যে খরচ করছেন—এমন পার্টি হাতছাড়া হয়ে গেলে শেষে আফসোস করতে হবে—

সাহেব-বৌদি বাধা দিয়ে বললে—ইউসুফ তুই চুপ করতো—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—তুই সত্যিই যাবি না ?

বললাম—না—

সাহেব-বৌদি বললে—কিছুতেই যাবি না, না ?

তবু বললাম—না, তোমায় আমি সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়েছি, তোমার পা জোড়া কোলে নিয়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছি, তোমায় একদিন কালীঘাট থেকে শাখা কিনে এনে দিয়েছি, অলোকেশদা'র অসুখের সময় তোমাদের গীর্জার ঠাকুরের কাছে মানত করেছি, কাল ঠাকুরের পুজো দিয়েছি—কী করিনি বলো তো ?

সাহেব-বৌদি হাসতে লাগলো। বললে—তাতে কী ফল হয়েছে ? অলক মারা যাবার সময় সে-শাখা সিঁদুর আলতা সব তো ফেলেই দিতে হলো, তোর ঠাকুর কি আমার ঠাকুর, কেউ কি কিছু শুনলে ?

বললাম—তা বলে টাকাই তোমার কাছে এত বড় হলো সাহেব বৌদি ? টাকা পেয়েই কি তোমার দুঃখ ঘুচবে ? এত টাকা তোমার কিসের দরকার বলো তো ! টাকার জন্যে তা বলে তুমি নিজেকে বলি দেবে ?

সাহেব-বৌদি যেন বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললে—থাম তুই, বড় হলে বুঝতিস্ টাকার কি দাম !

বললাম—আমি আর সেই কচি খোকা নই সাহেব-বৌদি, সব বুঝতে পারি—

সাহেব-বৌদি বললে—খুব হয়েছে, আমার ছেলে হলে আজ তোর চেয়েও বড় হতো—আমার কাছে তুই কচি খোকা নোস্ তো কী শুনি ?

বললাম—তবু আমি সব বুঝি সাহেব-বৌদি—হোটেলে তুমি কেন

যাও, কেন সুলতানগঞ্জের ছোট কুমার সাহেব রাত্তির বেলা তোমার খোঁজে আসে—

সাহেব-বৌদি বললে—তোকে আর কিছু বুঝতে হবে না, তুই বেরিয়ে যা এখান থেকে।

তারপর ইউসুফের দিকে চেয়ে বললে—যা তো ইউসুফ, দোকান থেকে জুতো গয়না গাউন সব নিয়ে আয়, বলবি ভোরবেলা টাকা পাবে—

ইউসুফ যাবার সময় আমার দিকে কটাক্ষ করে বলে গেল—কেন ঝুট ঝামেলা বাড়াচ্ছ ভাই, সরে পড়ো না—

মনে আছে সেই রাত্রে সেই অপরিচিত কদর্য পল্লীতে সাহেব-বৌদির ততোধিক কদর্য ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমার যেন সংজ্ঞা লোপ পেতে বসেছিল। কেন জানিনা মনে হলো আর কয়েক মুহূর্ত পরেই একটি প্রাণী একেবারে আমার চোখের সামনেই রসাতলে তলিয়ে যাবে। আমার চোখের সামনে একটি মানুষ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করবে আর আমি নিঃসহায়ের মত চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখবো শুধু! আমার কিছুই করবার থাকবে না। সাহেব-বৌদির সমস্ত শিক্ষা, সতীত্ব, সংযম, শুধু টাকার বন্যায় ভেসে মাটিতে মিশিয়ে যাবে। আরো মনে আছে সাহেব-বৌদিও সেদিন আমার মুখোমুখি শুধু দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সাহেব-বৌদি বললে—এবার যাবি তো লক্ষ্মীটি।

চোখ কি আমারই শুকনো ছিল! বললাম—আমি যাবো না, দেখি তুমি কেমন করে আত্মঘাতী হও—

সাহেব-বৌদি হাসলো এবার। বললে—আমি যদি আত্মঘাতী হই তোর কী? তুই কে আমার?

বললাম—আমি কেউ নই তোমার জানি—কিন্তু তোমার যদি ছেলে থাকতো?

কথাটা শুনে সাহেব-বৌদি এক নিমেষে একেবারে অন্যরকম

হয়ে গেল। মুখ দিয়ে তার আর কথা বেরোল না। বললাম —তোমার ছেলের সামনে এমনি করে যেতে তোমার লজ্জা করতো না?

সাহেব-বৌদি গুম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ।

আমি কাছে গেলাম। সাহেব বৌদি তবু বিছানার ওপর বসেই রইল অনেকক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে বললে—হ্যাঁরে, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারিস্ তুই?

বললাম—কেন পারবো না? কোথায় যাবে তুমি বলো?

—যেখানে হোক।

কী জানি কী হলো। বললাম—আমাদের বাড়িতে যাবে সাহেব-বৌদি?

সাহেব-বৌদি বললে—যেখানে হোক, এ-পাড়ায় আর নয়—

তারপব আবার সাহেব-বৌদি কী যেন ভাবলে। বললে—তোদেব বাড়ি? আমাকে থাকতে দেবে তোব মা?

তারপর আবার নিজেব মনেই যেন বলে যেতে লাগলো—আমি আবার ভালো হয়ে যাবো, আমি আবার থান কাপড় পরবো, নিরামিষ খাবো, তোদের সংসারের সব কাজ কবে দেব!

সাহেব-বৌদিকে বাধা দিলাম না। বড় করুণা হতে লাগলো, বড় মায়া হলো সাহেব-বৌদিকে দেখে।

সাহেব-বৌদি আবার বলতে লাগলো—এক একদিন বড় খারাপ লাগে আমার, জানিস্, রাত তিনটের আগে কোনওদিন ছাড়ে না ওরা, ওদের সঙ্গে সমানে ফুর্তি করতে হয়, সমানে মদ খেতে হয়। একটু ঘুম পেলেও ওরা ছাড়ে না—একটু শরীর খারাপ হলেও ওরা রেহাই দেয় না—

বললাম—কিন্তু তাই-ই তো ভালো লাগে তোমার!

—তা লাগে বৈকি! কান্না পেলেও কাঁদতে পাবরো না, ঘুম

পেলেও ঘুমোতে পারবো না, খেতে ইচ্ছে না করলেও মদ ফেলে দিতে পারবো না—এ আমার খুব সুখের জীবন বৈকি!

বললাম—মরতে যদি তোমার নিজেরই এত সাধ, কে তোমায় বাঁচাতে পারবে বলো!

সাহেব-বৌদি বললে—অথচ বাঁচবো বলেই এখানে এসেছিলাম, অলককে বিয়ে করেছিলাম—

বললাম—কিন্তু সত্যি করে কি বাঁচতে চেয়েছিলে তুমি?

সাহেব-বৌদি বললে—জানিস্ এক-একদিন এদের অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় আমার।

বললাম—তবে যে বলছিলে, এরাই তোমাকে বাঁচিয়েছে, এখানকার আবদুল, ইউসুফ—

সাহেব-বৌদি বললে—ওরা বাঁচিয়েছে সত্যি, কিন্তু তখন কি জানতুম ওরা দালাল, আমার আয়ের প্রত্যেক পয়সার ওপর ওদের অংশ থাকবে, আমার প্রতিটি রক্ত-কণা নিয়ে ওরা ব্যবসা ফাঁদবে—

সাহেব-বৌদির কথাগুলো শুনে কেমন যেন ভয়ে শিউরে উঠলাম।

বললাম—তবু তুমি বেঁচে আছো কেমন করে তাই ভাবছি সাহেব-বৌদি—

সাহেব-বৌদি বললে—বেঁচে আমি নেই রে, এই দেখ—

বলে ডান হাতের আঙুল দিয়ে একটা চোখের পাতা উঁচু করে দেখালে। বললে—এতটুকু রক্ত নেই শরীরে, ডাক্তার বসাক বলে এরকম করলে আমি আর বাঁচবো না বেশিদিন—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—একদিন হোটেলে হল্লা করতে করতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, অনেক রাত্রে এই ইউসুফ আমাকে তুলে এনে ডাক্তার বসাকের কাছে নিয়ে গিয়ে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলে—

তারপর হঠাৎ গাউনের পায়ের দিকটা উঁচু করে বলে—এই দেখ

এখানে কেটে গিয়েছিল, এখনও দাগ রয়েছে—টাকা অবশ্য উপায় করি, কিন্তু ওষুধ কি কম খেতে হয়, ডাক্তার বসাকের কাছে কত টাকা এখনও দেনা রয়েছে—ভয় হয় হয়ত একদিন যক্ষ্মা হবে, কাশতে কাশতে রক্ত উঠে মরেই যাবো—

কী আর বলবার ছিল আমার। চেয়ে দেখলাম ওষুধের খালি শিশি বোতলে ভর্তি হয়ে গেছে মিটসেফের মাথাটা!

সাহেব-বৌদি বলতে লাগলো—যেদিন ভাবি আজ আর যাবো না হোটেলে, ওই আবদুল আসে, ইউসুফ আসে, ওরা ধরে তুলে দেয়, গাউন এনে দেয়, জুতো এনে পরিয়ে দেয়, তারপর রিক্‌শা ডেকে চড়িয়ে দেয়,—ওদেরই দলের রিক্‌শাওয়ালা, সোজা নিয়ে যায় হোটেলের বারে,—সেখানে গিয়ে কোথা দিয়ে কী হয়, কিছু বুঝতে পাবি না—

এবারও কিছু বলতে পারলাম না। সাহেব বৌদির চোখ দিয়ে অসাড়ে জল পড়তে লাগলো।

সাহেব-বৌদি বললে—গালে রঙ মেখে, চোখে সুর্মা দিয়ে, ভুরুতে তুলি টেনে, ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে অনেক কষ্টে আবার যুবতী সাজতে হয়, প্যাড আর ব্রেসিয়ার লাগিয়ে রাত্রের অন্ধকারে কুমারী সেজে রাজা-মহারাজা আর ক্যাপটেন-মেজরদের মন ভোলাতে হয়—সে যে কী পাপ তা কে আর জানবে বল—

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললে—কি রে, তুই যে কিছু কথা বলছিস্ না?

তবু আমার মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না—

সাহেব-বৌদি আমার চিবুকটা ধরে তার মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে—তোরও ঘেন্না হচ্ছে তো আমায়?

এর উত্তরে কী যে বলবো বুঝতে পারলাম না।

সাহেব-বৌদি বললে—আমার নিজেরই ঘেন্না হয় আমার ওপর, তা তোর তো হবেই—

এতক্ষণে বললাম—সাহেব-বৌদি, তুমি আবার বাঁচতে চাও ?

সাহেব-বৌদি বললে—তুই এই আবদুল আর ইউসুফের হাত থেকে আমায় বাঁচা ভাই—

বললাম—তুমি আজ আমার সঙ্গে যাবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—যাবো, তুই যেখানে নিয়ে যাবি যাবো—

—কিন্তু এই জীবন তোমায় ছাড়তে হবে।

সাহেব-বৌদি বললে—ছাড়তে পাবলে তো বেঁচে যাই রে—

বললাম—আর এই টাকার নেশাও তোমাকে ত্যাগ করতে হবে—

সাহেব-বৌদি কী যেন ভাবতে লাগলো। কিছু কথা বলতে পারলে না কিছুক্ষণ! উদাস দৃষ্টি দিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—কিন্তু টাকা যে আমাব চাই—

বললাম—তোমাকে আমি মায়ের মত আদরে রাখবো সাহেব-বৌদি—তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ; খাওয়া, পরা, সুখ, শান্তি সব দিতে চেষ্টা করবো, আমি যা খাবো তোমাকেও তাই খাওয়াবো,—

সাহেব বৌদি বললে—তোদের বাড়িতে রাখবি আমাকে ?

বললাম—আমি চাকবি পেয়েছি একটা, সেই টাকা দিয়ে তোমাব জন্যে ঘরভাড়া করবো, তোমার জন্যে চাকর ঝি সব থাকবে, তোমায় সে-জন্যে কিছু ভাবতে হবে না—তুমি যাবে আমাব সঙ্গে সাহেব-বৌদি ?

সাহেব-বৌদি বললে—কিন্তু

বললাম—নিজের মা'র মতো তোমার সেবা করবো সাহেব-বৌদি, যাবে তুমি ?

সাহেব-বৌদি আমার দিকে করুণ চোখে চাইলে। বললে—কিন্তু টাকা ?

বললাম—টাকা তোমার কীসের দরকার বলো ? তোমার হাত-খরচের জন্যে ? সে আমি দেব !

সাহেব-বৌদি বললে—হাত খরচের জন্যে আমার কিছু দরকার নেই—

—তবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—টাকা যে আমার চাই-ই রে—

—কেন চাই, তা তো বলবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—টাকা আমার চাই, টাকা না হলে আমার চলবে না, অনেক টাকা চাই, হাজার-হাজার টাকা—

বললাম—অত টাকা নিয়ে করবে কী ? গয়না গড়াবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—না, গয়না গড়ার শখ আমার মিটে গেছে—

—তবে ? বাড়ি করবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—বাড়ি, বাড়ি আমার কী হবে ?

—তবে কি গাড়ি কিনবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—গয়না বাড়ি গাড়ি—আমার কোন সাধ আর নেই—আমি কিছুই চাই না, তবু আমার টাকা চাই—আমার টাকা চাই—টাকা আমার চাই ই—

যেন পাগলের মত প্রলাপ বকতে লাগলো সাহেব-বৌদি। সাহেব-বৌদির মুখের দিকে চেয়ে যেন ভয় করতে লাগলো। একটু আগে মদ খেয়ে এসেছে, হয়ত তার নেশা এখনও কাটেনি। এতক্ষণে ঘামে কান্নায় মুখের, ঠোঁটের, চোখের রঙ সব ধুয়ে গেছে, ময়লা ছেঁড়া গাউনের আড়ালে সাহেব-বৌদির শরীরের দারিদ্র্য যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে হলো যেন সত্যিই সাহেব-বৌদির কোনও কঠিন অসুখ হয়েছে ভেতরে ভেতরে। যেন আর বেশিদিন এমনি করে চললে মরে যাবে !

আমি অভিভূতের মত সাহেব-বৌদির সেই উন্মাদ রূপ দেখতে লাগলাম বসে বসে।

হঠাৎ বাইরে ইউসুফ যেন ডাকলে—মিসি-মায়ি—

সাহেব-বৌদি সচকিত হয়ে উঠলো এক নিমিষে। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে—কে, ইউসুফ মিয়া ?

ইউসুফ ঘরের ভেতর এল। হাতে হ্যাঙারে ঝোলানো নতুন সিল্কের গাউন, আর এক হাতে কাগজের বাক্সে জুতো। আর পকেট থেকে বার করলে, গলার একছড়া নকল মুক্তোর হার, নকল হীরের চুড়ি, পাউডার, পমেড, হেয়ারপিন, আরো অনেক কিছু—

ইউসুফ তখনও আমাকে দেখে যেন একটু অবাক্ হয়ে গেছে। আমার দিকে একবার একটা ক্রূর কটাক্ষ করলে। তারপর বললে—ছোটকুমার সাহেব বহুত গোসা হয়েছে মিসি-মা, একটু জল্‌দি করুন—মাল-টাল সব রেডি করে রেখেছে—

কী জানি বড় ঘৃণা হলো লোকটার ওপর। লোকটার জঘন্য কদর্য চেহারাটা চোখের ওপর যেন বিষের মত মনে হলো। মনে হলো এখনি এই মুহূর্তে লোকটার হাত থেকে মুক্তি পেলে যেন বাঁচা যায়। সাহেব-বৌদিকেও বাঁচানো যায়।

বললাম—তুমি চলে যাও ইউসুফ—তোমার মিসি মা যাবে না—

ইউসুফ যেন অবাক্ হয়ে গেল আমার কথা শুনে। বললে—যাবে না ?

বলে সাহেব-বৌদির দিকে চাইলে।

আবার বললাম—না যাবে না !

সাহেব-বৌদি একবার আমার দিকে চাইলে, আর তারপর একবার ইউসুফের দিকে চাইলে। কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। যেন মনে-মনে যন্ত্রণায় ছটফট করছে বুঝতে পারলাম।

বললাম—তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না সাহেব-বৌদি, আমি তোমাকে যেতে দেব না !

সাহেব-বৌদি যেন ফণা তুলে দাঁড়াল। বললে—হ্যাঁ আমি যাবো—

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। একটু আগেও যে কেঁদেছে, যে

এখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করেছে, যে অপমৃত্যু থেকে বাঁচবার জন্যে হাহাকার করেছে, তার এই ব্যবহার দেখে কেমন যেন অবাক্ হয়ে গেলাম।

কিন্তু তখনও কি জানি যে অবাক্ হবার আমার আরো অনেক বাকি আছে!

সাহেব-বৌদি ইউসুফের কাছ থেকে পোশাক জুতোজোড়া নিলে। বললে—তুই এখন যা—

আমারও যেন জিদ বেড়ে গেল। বললাম—না আমি যাবো না—

সাহেব-বৌদি বললে—রাত অনেক হয়েছে—

বললাম—তা হোক—

সাহেব-বৌদি বললে—তোর মা তোকে বকবে—তুই বাড়ি যা—

বললাম—কিছুতেই যাবো না—তোমাকে নিয়ে তবে যাবো—

সাহেব-বৌদি বললে—আমি তোর কে শুনি?

ইউসুফ এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিল কিন্তু আমাদের সম্পর্কের সূত্রটা বুঝতে পারছিল না। এবার আমার গায়ে হাত দিতে আসতেই সাহেব-বৌদি চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে উঠলো—খবরদার ইউসুফ, খবরদার—

ইউসুফ চুপ করে গেল। সাহেব বৌদি বললে—আমি পোশাক বদলাবো—তুই এখন যা—

বললাম—না—

সাহেব-বৌদি বললে—আমার যে আর ঘর নেই,—তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া—

তবু বললাম—না, বাইরে আমি যাবো না—তোমাকেও যেতে দেব না—

সাহেব-বৌদি এবার আমার হাত ধরে আমাকে বাইরে ঠেলে দিলে। বললে—আমি বলছি তুই যা—

আমিও বাধা দিতে লাগলাম। কিন্তু সাহেব-বৌদির হাতের স্পর্শ

লাগতেই সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সাহেব-বৌদি এত দুর্বল। সাহেব-বৌদি এত ক্ষীণজীবী! মনে হলো এক ফুঁয়ে যেন সাহেব-বৌদি উড়ে যাবে। যেন একটু ঠেলা লাগলে পড়ে যাবে মাটিতে, আর উঠবে না। বড় মায়া হ'ল। বড় করুণা হ'ল আমার। মনে হ'ল অনেকদিন যেন খেতে পায়নি। যেন খায়নি পেট ভরে। শুধু মদ গিলেছে।

আর বাধা দিতে ইচ্ছেই হ'ল না। অপমানিত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম ধীরে ধীরে। সাহেব-বৌদি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে। উঠোনের কোণে খাঁচার হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলো। পাশের ঘরের মেয়েরা পায়ের শব্দ পেয়ে উঁকি মেরে দেখলে একবার, তারপর আবাব সিগারেট টানতে লাগলো।

তারপর বাইরের রাস্তায় হোটেলটার আলো আর জাঁকজমক পেরিয়ে গ্যাসের আলোর নিচের অন্ধকারটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সাহেব-বৌদির বাড়ির গেটের সামনে বিরাট একখানা নতুন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেইদিকে চেয়ে রইলাম।

খানিকক্ষণ পরে দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে ভৌতিক এক নারী-মূর্ত্তি যেন গেট দিয়ে বেরোল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম গ্যাসের আলোটা গায়ে পড়তেই গায়ের নকল হীরে-মুক্তোর গয়নাগুলো ঝকমক করে উঠলো। সেই সিল্কের গাউন—সেই সব। আবার সেই মোহিনী মূর্তি। রঙ, লিপস্টিক, পাউডারে আবার সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতী হয়ে উঠেছে!

তারপর মটরটার পেছনে লাল দুটো বিন্দুর মত আলো জ্বলে উঠলো। শব্দ হলো বিকট আর ধোঁয়া ছাড়িয়ে গাড়িটা চলে গেল গলি দিয়ে পূব দিকের রাস্তা বরাবর।

সাহেব-বৌদি আমার জীবনের হয়ত সামান্য একটি ভগ্নাংশ মাত্র। বহু লোক, বহু চিন্তা, বহু সমস্যার সমন্বয়ে যে-জীবন, সেখানে সাহেব-

বৌদির মূল্য কতখানি তা সহজেই অনুমান করতে পারি। একজন এসেছে, একজন গেছে। এমনি করে এক থেকে অসংখ্যের পদধ্বনি মুখর করেছে আমাকে। কিন্তু যখন যার কাছে থেকেছি, যাকে ভালবেসেছি, মনে হয়েছে সে চলে গেলে জীবন বুঝি শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে কিছুই হয়নি। আসলে কিছুই হারাই নি। সকলের হারানো সঙ্গর সমষ্টি আমার জীবনে ধ্রুব হয়ে রইল—এইটেই আমার জীবনের চরম সত্য। বার বার হারিয়ে হারাবার বেদনায় যেমন কাতর হয়েছি, পাবার উল্লাসেও তেমনি উল্লসিত উচ্ছ্বসিত হয়েছি।

তোমরা আর পাঁচজন যখন লেখাপড়া, রাজনীতি, সাহিত্য, সিনেমা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ, আমি তখন কিছুই করিনি। আমি মানুষ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি শুধু। আমি জীবন নিয়ে ঘেঁটে বেড়িয়েছি—যে-জীবন জন্মের সঙ্গে শুরু আর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যার শেষ। যে-জীবন কোন্ এক অমোঘ নির্দেশে গড়ে যেমন, আবার ভাঙেও তেমনি। যে-জীবন অনুকূল অবস্থা পেয়েও ব্যর্থ হতে পারে আবার প্রতিকূল আবহাওয়াতেও ধ্রুব হয়ে ওঠে।

আমাদের অফিসের ভবনাথবাবু বলতেন—কলিযুগে বড়বাবুই সার—আর সবই অসার হে—

আমার দিদির খুব গরীব ঘরে বিয়ে হয়েছিল। দিদি বলতো—দেখলাম কলিযুগে পয়সাই সার—

বাবা বলতেন—আমাদের ডিকিনসন্ সাহেবকে দেখেছি শুয়োরের মাংস গরুর মাংস দিব্যি খেয়ে হজম করে ফেলে, আমাশা হয় না—ওরাই হলো আসল সত্যযুগের মানুষ—

আর আমাদের বাড়িতে বুড়ো বসন্ত পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করতে আসতেন। বলতেন—শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ গমনের পর থেকেই কলিযুগ আরম্ভ—

বলতাম—কলিযুগের কী কী লক্ষণ ঠাকুর-মশাই?

বসন্ত পণ্ডিত বলতেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুকদেব বলছেন, কলিযুগের লক্ষণ হলো—অভিরুচিমত স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য, রতিকৌশল দিয়ে স্ত্রী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, পৈতে দিয়ে ব্রাহ্মণের পরিচয়, চটুল কথা দিয়ে পাণ্ডিত্য আর দম্ভ দিয়ে সাধুত্বের বিচার—

তখন ভাবতাম, ভেবে অবাক হয়ে যেতাম, ওই অতযুগ আগে এ সব কথা পণ্ডিতরা কেমন করে জানতে পেরেছিলেন! শুকদেব কেমন করে জানতে পেরেছিলেন—কলকাতায় এক গলিতে সাহেব-বৌদিকে নিয়ে ওই গল্প লেখার উপাদান তৈরি হবে একদিন। কেমন করে জানতে পেরেছিলেন এক আধুনিক গল্পকার তার কাহিনীর বিষয়-বস্তু খুঁজবে এক নষ্ট চরিত্রেব নারীর মধ্যে! সমস্ত বাঙলা দেশ জুড়ে সবাই যখন চালের আর জীবনের ফট্‌কা চালাচ্ছে তখন তাদেবই চোখের আড়ালে এক ভাবী গল্পকার অন্য সব ছেড়ে এক কাঞ্চন কামিনীর মোহে পড়ে আর এক নতুন জগৎ আবিষ্কার কববে!

শুকদেব পণ্ডিত ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন, ঋষি ছিলেন। তিনি ত্রিগুণাতীত পুরুষ।

কিন্তু একটা জিনিস তিনিও জানতেন না।

সেইটেই সাহেব-বৌদি আমাকে জানিয়ে দিলে।

তিনি জানতেন না কিন্তু সে-কথা এখন থাক!

সেদিন সাহেব-বৌদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেও সাহেব-বৌদিকে যে ভুলতে পারবো না, তা জানতাম। সুযোগ পেলেই ঘুরে ফিরে সন্ধ্যের অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াতাম গলিটার মোড়ে। দূর থেকে চেয়ে দেখতাম তেতলার ঘরটার দিকে। কোন আভাস যদি পাই। কোনও ইঙ্গিত। কোনও ইশারা। সাহেব-বৌদির পুরোন বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বার বার ফিরে দেখতাম। যেন সাহেব-বৌদির স্পর্শের সুগন্ধ লেগে আছে তার সর্বাঙ্গে। যেন বাড়িটার কাছে গেলেও সাহেব-বৌদিব সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। যারা বাড়িটা মামলা করে পেয়েছে, তারাও ওটাতে আর হাত লাগায়নি। যেমন

ছিল তেমনিই আছে। কোথায় তারা মীরাটে না দ্বারভাঙ্গায় থাকে। হয়ত বিক্রি করে দেবার মতলব। চেহারাটা দেখতে দেখতে ভাবি, কার বাড়ি কে ভোগ করে। সেজ-জ্যাঠামশাই-এর কত সাধের বাড়ি। নিজে তদারক করে বাড়ি করিয়েছিলেন।

সেজ-জ্যাঠামশাই বলতেন—আমি করে গেলাম—ছেলের যদি ক্ষমতা থাকে তো আর একটা করবে—

বড়-জ্যাঠামশাই বলতেন—ছেলে তোমার ব্যারিস্টার হয়ে আসছে—সে কি আর এই গলিতে থাকতে চাইবে ভাবছো ?

সেজ-জ্যাঠাইমা বলতো—এই দেখ মা, ছেলের বউ থাকবে এই ঘরে, আর এই ঘরে আমরা বুড়ো-বুড়ি—

সব ব্যবস্থা পাকা করা ছিল। সেজ-জ্যাঠামশাই নিজেই ছিলেন পাকা-চৌকশ লোক। কোনও ত্রুটি রাখেন নি কোথাও। নাতি-নাতনী কোথায় তার ঠিক নেই, নাতি-নাতনীর পড়ার ঘর হ'ল আগে থেকেই। আঁতুড়ঘর হ'ল। ছেলে-বৌ-এর শোবার-ঘরের পাশে বাথরুম। ছেলে-বৌ এর কষ্ট হবে ভেবে কোনও কল্পনা অপূর্ণ রাখেননি। ইটালিয়ান কোম্পানি ঘরের মেঝে বানিয়ে দিলে। ছেলের বউ এইখানে বসে আলতা পরবে, বউমা এইখানে বসে রোদ্দুরে চুল শুকোবে, বউমা এইখানে বসে মহাভারত-রামায়ণ পড়ে শোনাবে শাশুড়ীকে।

আহিরিটোলা থেকে বোসেদের বাড়ির বড় কর্তা নিজে এলেন সম্বন্ধ নিয়ে।

সেজ-জ্যাঠামশাই হেসেই আকুল। বললেন—ছেলেই রইল বিদেশে, এখন তার বিয়ের সম্বন্ধ—আগে ফিরে আসুক সে—

বোস-কর্তা বললেন—তাতে কি মিত্তির-মশাই, ছেলে আপনার পাশ করে আসুক না—তার আগে সম্বন্ধটা তো পাকা হয়ে থাক্—ক্ষতি কী !

চন্দননগর থেকে বিখ্যাত দত্ত বংশের মেজবাবু হাজির হলেন।

বললেন—আপনারা হলেন আমার বড় ভাই-এর শ্বশুরের আপন মামাতো-ভাইএর · · ·

সবাইকে ওই একই উত্তর দিলেন সেজ-জ্যাঠামশাই। বললেন—ছেলে আসুকই তো আগে······

দোকানে কাপড় গয়না কিনতে গিয়ে সেজ-জ্যাঠাইমা বউ-এর জন্যে শাড়ি-ব্লাউজ পছন্দ করে আসতেন। বলতেন—বউমার জন্যে ওমনি একটা শাড়ি কিনলে হয়—

এমনি কত স্বপ্ন, কত কল্পনা দুজনের! তা সেই বউমা তারপর এলও শেষ পর্যন্ত। দুধ-আলতা গায়ের রঙ। টানা-টানা ভুরু, যা চেয়েছিলেন শ্বশুর-শাশুড়ী। কিন্তু ভাগ্যিস আজ বেঁচে নেই সেজ-জ্যাঠাইমা। মরে বেঁচেছেন তিনি!

রাঙা-কাকিমা বলে—আমি তখুনি বলেছিলাম—ওরা সুখের পায়রা, পোষ মানবে না—

হয়ত রাঙা-কাকিমার কথাই সত্যি! আমারই ভুল।

যে-বাবা ডিকিনসন সাহেবের বউ-এর উদাহরণ দিতেন, সেই বাবাও অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন শেষে। কিন্তু সাহেব-বৌদির কথা নিয়ে আলোচনা করাও তখন থেমে গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। এক জিনিস চিরকালই কি মুখরোচক থাকে! মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে। পাশের বাড়ির বউ কেমন বেহায়াপনা করে। কোন এক বাড়ির আইবুড়ো মেয়ে সিনেমায় যেতে পায়নি বলে টিঙচার-আইওডিন খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, বুড়ো বয়েসে শাশুড়ী-বউএর একসঙ্গে ছেলে হয়েছে একই আঁতুড় ঘরে, এ-সব আরো টাটকা খবর, আরো মুখরোচক।

বলতে গেলে সাহেব-বৌদির কথা একলা তখন আমিই কেবল বোধহয় ভুলতে পারিনি।

হঠাৎ সেদিন কী হলো কে জানে, সাহেব-বৌদির পুরোন বাড়িটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে লেটার-বক্সটার দিকে নজর পড়তেই কেমন

যেন কৌতূহল হলো। ফাঁক দিয়ে দেখলাম—যেন গোটাকতক চিঠি পড়ে আছে ভেতরে। কবেকার চিঠি! কতদিন আগে, কতমাস আগে সাহেব-বৌদি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে—এখনও কেউ হাত দেয়নি। কেউ দেখতে পায়নি। চিঠি নেবার লোকও নেই!

সেদিন রাত্রেই লোহার সাঁড়াশী দিয়ে কাঠের বাক্সটা খুলে চিঠি-গুলো বার করে নিলাম।

একটা নয়, অনেকগুলো চিঠি। সব বিলেত থেকে আসছে।

সে-রাত্রে আর আমার ঘুম এল না। মনে আছে, রাত দু'টো তিনটে পর্যন্ত আকাশ-পাতাল ভেবেছি। এ কেমন করে হয়! এ কেমন করে সম্ভব হয়! সাহেব-বৌদি বাপ মায়ের আদুরে একমাত্র মেয়ে বলেই জানতাম। কত বড়লোক সাহেব-বৌদিরা। কত ঐশ্বর্য! সব ঐশ্বর্য ছেড়ে, নিজের জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে শুধু অলোকেশদা'র প্রেমের জন্যে বাঙলা দেশে বউ হয়ে এসেছে—এ কথাই তো শুনেছিলাম। কিন্তু সব আমার গোলমাল হয়ে গেল আবার। মনে হলো—এতদিন তবে কি সব মিথ্যে কথা বলেছে সাহেব-বৌদি! সব ভেজাল! যা কিছু শুনেছি সব! সব! এমন করে আমার সমস্ত ভালবাসা মূল্যহীন করে দিলে এক নিমেষে! এমন মিথ্যেবাদী! সাহেব-বৌদি শুধু যে বিশ্বাসঘাতক তাই-ই নয়, মিথ্যেবাদীও! সমস্ত বুকটা যেন আমার ফাঁকা হয়ে গেল। সাহেব-বৌদির বিশ্বাসঘাতকতায় আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলকে যেন বিষ মনে হলো। সেদিন আর অফিস গেলাম না। ডালহৌসী স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসে বসে সময় গড়িয়ে গেল আস্তে আস্তে। সামনের পুকুরে কয়েকটা পোকা জলের ওপর লাফাতে লাফাতে এ-কোণ থেকে ও-কোণে চলে গেল।

আমি সমস্ত দিন চুপ করে বসে রইলাম।

সাহেব-বৌদির চিঠিগুলো কাঁটা হয়ে ফুটতে লাগলো আমার পকেটে। মনে হলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জলে ফেলে দিই। সমস্ত সম্পর্ক চুকে যাক। সাহেব-বৌদি নিজেই যখন আর কোনও

সম্পর্ক রাখতে চায় না আমার সঙ্গে, তখন তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ! একদিন বিদেশ থেকে বউ হয়ে এসেছিল অলোকেশদা'র বাড়িতে, তার বেশি আর কিছু নয়। কত লোক মেম-সাহেব বিয়ে করে আনছে, কেউ এদেশে এসে বাঙালী হতে পারেনি। কিছুদিন চেষ্টা করেছে মানিয়ে চলতে, আবার যখন মন চেয়েছে, ফিরে চলে গেছে নিজের দেশে! সাহেব-বৌদিও পারলো না থাকতে, তাই নিজের পথ নিজেই বেছে নিলে। আমাব পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা না-লাগার প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

সমস্তটা দিন যে কী করে কাটালাম তা আমিই জানি। সমস্ত কলকাতাটা যেন চষে ফেললাম। কোথা দিয়ে বেরিয়ে কোন্ রাস্তা দিয়ে ঢুকে কোথায় গেলাম---তা চিনতে পারলাম না। মনে হলো সাহেব-বৌদির বাড়িটার চারপাশেই যেন বার বার প্রদক্ষিণ করেছি। সাহেব-বৌদিকে দূরে ঠেলতে গিয়ে, সাহেব-বৌদিকে ভুলতে গিয়ে যেন সাহেব বৌদিকেই বার বার স্মরণ করেছি।

আজো মনে আছে সে আমার কী ভীষণ দিন গেছে। এখন হাসি পায় নিশ্চয়ই। হাসি পাওয়া অন্যায়ও নয়—একথা আজ বুঝতে পারি। কিন্তু তখন বয়েস হলেও বুদ্ধি বোধহয় আমার আচ্ছন্ন ছিল সাহেব-বৌদিতে! রাত্রির বেলা ক্লান্ত হয়ে নিজের বাড়ি ফিরে এসেছি।

এমনি কি একদিন! এমনি কি দুদিন! কতদিন কত সন্ধ্যে আমার পাগলের মত কেটেছে। সমস্ত কলকাতার জীবনে যা ছিল তা-ই আছে। কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। ট্রাম বাসগুলো আপন নিয়মে চলেছে। মানুষের ভিড় ফুটপাথে নিত্যকার মত ঘনিয়েছে। আর রাত্রির অন্ধকারে আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এসেছে শহর, সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে পৃথিবী। যে-যার আশ্রয়ের আড়ালে নিশ্চিন্তে গিয়ে বিশ্রাম করেছে। কিন্তু আমার সে কি প্রাণান্তকর ক্লান্তি, প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। যেন কেউ আমায় চরম আঘাত করেছে, কেউ আমার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যেন আমার সর্বস্ব অপহরণ করেছে কেউ। মনে হলো সুলতানগঞ্জের ছোটকুমার সাহেব যেন আমার শত্রু! ছোটকুমার সাহেবকে আমি দেখিনি, তার অগাধ টাকা। টাকার প্রলোভনে যেন কেড়ে নিয়েছে আমার অন্তরাত্মাকে। বিকেল বেলা সাহেব-বৌদির পাড়াতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। নানারকম জনতার ভিড়ে আমায় কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু আমি দেখি একটা কাক হয়ত উড়ে এসে বসলো বাড়িটার ছাদের আলসেতে। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চাইল, তারপর আবার হঠাৎ উড়ে গিয়ে অন্য ছাদে বসলো। একটা ছোট গাছ গজিয়েছে দেওয়ালের ফাটলে। তুচারটে সবুজ পাতা সবে উঁকি দিয়েছে ইট-চুন-সুরকির ফাঁকে। একটা লাল-রঙের ঘুড়ি এসে আটকে রইল সাহেব-বৌদির ঘরের মাথায় নেড়া বাঁশটাতে। কখনও বা একটা ময়লা গাউন কি সেমিজ কি পেটিকোট শুকোতে দিয়েছে পশ্চিমদিকে কাঠের রেলিং-এ। মনে হতো, সব সুন্দর, সব চমৎকার। ওই কাকটা, ওই ঘুড়ি, ওই অশথ গাছের চারা, ওই সায়া, সেমিজ, পেটিকোট সব যেন আমার চোখে অপরূপ হয়ে উঠতো। আর আমি রোদ্দুরে বৃষ্টিতে নিচের রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল তাই দেখতাম।

পকেটের এক গাদা চিঠি বার বার পকেট থেকে বার করে দেখতাম। বহুবার পড়া চিঠিগুলো আবার পড়তে শুরু করতাম সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আর চিঠিও কি একখানা-তু'খানা!

পাড়ায় পিওনের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম—মিসেস নোরা মিত্রের কোনও চিঠি আছে?

পিওনরা ব্যাগ হাতড়ে দেখে বলতো—না—

মনে হতো যেন আরো চিঠি পেলে ভালো হতো। এ ক'খানা চিঠি যেন সাহেব-বৌদিকে আরো কাছে এনে দিয়েছে আমার। আরো ঘনিষ্ঠ করেছে। সাহেব-বৌদির ছোট ছোট ভাই-বোনেদের লেখা। মিষ্টি মিষ্টি সব হাতের বাঁকা-চোরা অক্ষর। অসংখ্য ভাই

বোন সাহেব-বৌদির। এত যে ভাই-বোন আছে সাহেব-বৌদির তাই-ই কি জানতাম। চিঠিগুলো পড়তে পড়তে যেন সাহেব-বৌদিকে আরো কাছে পেতাম। যেন সাহেব-বৌদিকে আপন মনে হতো। সাহেব-বৌদি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে বলে কিন্তু অভিমান হতো না আর। দুঃখ হতো না আর। মনে পড়তো সাহেব-বৌদির কষ্টের জীবনের কথা! দুঃখ আর অভাবের কথা! শীতের দিনে গরম-জামা পেত না পরতে, চা পেত না খেতে। কয়লা পেত না হাত-পা গরম করতে! সাহেব-বৌদি কি জীবনে কম কষ্ট পেয়েছে!

ভিন্‌সেণ্ট স্কোয়ারের এঁদোপড়া গলিতে একটা কুড়ি বছরের মেয়ে তেরোটা ভাইবোন নিয়ে এক হাতে রান্না করেছে, একহাতে সাবান কাচা করেছে, ঘুম পাড়িয়েছে ছোটদের, তারপর একদিন যখন দেখেছে ঘরে কিছু খাবার নেই, বাজারে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে বীন্, আলু, টোম্যাটো, শিম, কপি। বাজারের ফেলে দেওয়া পোকা পড়া জিনিসপত্র সব। চোখ বুজলে যেন দেখতে পেতাম—একটা মেয়ে বাড়ি থেকে থলি নিয়ে বেরিয়েছে বাজার করতে। যখন সবাই বাজার করছে, একটি মেয়ের নজর তখন মেঝের ওপর। ঝুড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল কার একটা বেগুন, দোকানদার দেখতে পেলে কিনা, সেই দিকেই তার নজর। তারপর লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকে টুপ করে কুড়িয়ে নিয়ে থলি ভর্তি করা। এমনি করে সংসারের সব ভার পড়লো এসে সেই ছোট্ট মেয়েটির মাথায়!

একটা চিঠিতে উইলি লিখেছে—দিদি, আমি এবার পাবলিক স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছি। এবার আরো দেড়শো পাউণ্ড পাঠিয়ে দেবে, নইলে আর পড়াশোনা হবে না। ম্যাটিল্ডার জন্মদিনে তুমি যে তিরিশ শিলিং পাঠিয়েছিলে তা দিয়ে তার একটা ওভারকোট কিনে দিয়েছি। মাম্মি সেই রকমই আছে। চোখে কিছু দেখতে পায় না একেবারে, কেবল খিটখিট করে—হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক মাসে তার ওষুধেই তিরিশ-চল্লিশ পাউণ্ড পড়ে—

গত মাসে তোমার পাঁচশো পাউণ্ড সব খরচ হয়ে গিয়েছে। এবার একটু বেশি পাঠিও—এবার ক্রীসমাসে সকলের খেলনা আর ফ্রক-স্যুট কিনে দিতে হবে—

বুড়ি-মা পাশের ঘর থেকে চেঁচায়। এমন গলার শব্দ যেন মনে হয় প্যাঁচা ডাকছে। এককালে মিসেস স্মিথের যৌবন ছিল বৈকি! দেমাক ছিল, ঠেকার ছিল। রূপও ছিল বোধহয়। একদিন যৌবন ভালো করে আসবার আগেই হৈ-চৈ পড়ে গেল গ্রামে। ডাক্তারই বা কে ডাকবে আর দাই-ই বা কে ডাকবে। শহরে যাবার বড় রাস্তাটার ওপর যে সাঁকোটা পড়ে, তারই নিচে সকলের অজ্ঞাতসারে ঘটনাটা ঘটলো। মিসেস্ স্মিথের তখন বিয়েই হয় নি। সন্ধ্যেবেলা আস্তে আস্তে গিয়ে একটা ইট মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লো সেই সাঁকোর তলায়। একটা টিকটিকি অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল। মানুষটা কাতরাচ্ছে পড়ে পড়ে। ভয়ে টিকটিকিটা সরে গিয়ে দূর থেকে দেখতে লাগলো। একবার এ-পাশ, একবার ও-পাশ করছে। বেশি জোরে চিৎকার করলে যেন তৃপ্তি পেত। তারপর টিকটিকিটাও অবাক্ হয়ে গিয়েছে। রক্তে ভেসে গেছে গাউন, কাদা মাটি—আর ছোট একটা মেয়ে সেই সাঁকোটার তলায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। টিকটিকিটা ভয়ে আরো শিউরে উঠলো—আরো কিছু দূরে একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলে। তারপর বড় বড় চোখ বার করে দেখতে লাগলো।

মা তার নাম রাখলে—নোরা—

সেই শুরু হলো নোরার জীবন। ছোট একটা পাথরের থিলেনের নিচে জন্মে আজ ফ্রী-স্কুল স্ট্রিটের ফ্ল্যাট বাড়িতে। কিন্তু মাঝখানের জীবনটাও বড় বিচিত্র!

একদিন এক পুলিশ কনেস্টবল এক মেয়ে-আসামীকে ধরে নিয়ে এসে একেবারে হাজির করেছে কোর্টে।

হাকিম জিজ্ঞেস করলে—কিসের চার্জ?

পুলিশ বললে—ধর্মাবতার, এ বাজার থেকে তরি-তরকারি চুরি করেছিল।

হাকিম জিজ্ঞেস করলে—কোলে ওটা কে?

আসামী বললে—হুজুর আমার মেয়ে—এর বাপ নেই—

আসামী সেদিন ছাড়া পেয়ে গেল। কিন্তু কোর্টের চৌহদ্দি পেরোতে না-পেরোতে বাপ জুটে গেল নোরার! রাস্তায় জুতো সেলাই করে। মা আর মেয়েকে দেখে মাথায় তার কি হ'ল কে জানে। নিজে আসামীর জন্যে এক-জোড়া পুরোন জুতো ঝোলা থেকে বার করে দিলে। তুজনকে বাড়ি নিয়ে গেল নিজের। বললে—এই হ'ল আমার রান্নাঘর, এই হ'ল ডাইনিং টেবিল, এই হ'ল বেডরুম।

অর্থাৎ একটা ঘরকেই তিনভাগ করে তিনটে ঘর করা হয়েছে! সেই থেকে নোরার নাম হ'ল—নোরা অসগুড। মার নাম হ'ল—মিসেস অসগুড। তারপর পর পর এল আরো তুই ভাই এক বোন। সেই তিন ভাই-বোনের ভার পড়লো নোরার ওপর।

তা শুধু কি একবার! এক-একজন স্বামীকে ছেড়ে আর একজনকে বিয়ে করেছে মা, আর নোরার নাম বদল হয়েছে পর-পর। শুধু নামই নয়, বাড়িও বদল হয়েছে, দেশও বদল হয়েছে, ভাইবোনের সংখ্যাও বেড়েছে। শেষে এসেছে মিস্টার স্মিথ। ব্যাণ্ডের দলে ঢোল বাজাতো সে-বাবা।

ছোটটাকে কোলে পিঠে মানুষ করতে না করতে আর একটা এসে হাজির।

নোরা বলতো—আমি আর পারবো না—

মা চেঁচাতো! বলতো—তা হলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরি, দেখি তুই কি করে না-পারিস্—

সাহেব-বৌদি বলেছিল—প্রত্যেকটা ছেলে হয়েছে মা'র, আর ভুগেছি আমি—আমার ঘুম পেতে নেই, আমার ক্ষিদে

পেতে নেই, আঁতুড়ঘর পরিষ্কার করে ভাইবোনদের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি—

শেষে এসে পৌঁছুল ভিন্‌সেন্ট স্কোয়ারে। তখন নোরার বয়েস কুড়ি।

ছোটবোন মিমি একটা চিঠি লিখেছে—আমার জন্মদিনে সেবার কিছু পাইনি, এবার একটা ট্রাইসাইকেল কিনে দিতেই হবে—আমার তের শিলিঙ জমেছে—মার নামে পাঠিও না, মা সব নিয়ে নেয়—

মেজ ভাই হেনরি লিখেছে—দিদি, দরজির দোকানে আমার তিনপাউণ্ড দেনা হয়ে গিয়েছে—আর দেনা দেবে না—গ্যাবার্ডিনের নতুন স্যুট করবো একটা ক্রিসমাসে, টাকা পাঠিও কিন্তু আমার নামে—দাদা টাকা এলে সব নিয়ে নেয়, কিছুই দেয় না আমাদের—

মা বলতো—এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে হচ্ছে দিন দিন—একটা পয়সা উপায় করবার নাম নেই—

অনেক রাত্রে ব্যাণ্ড মাস্টার যখন টল্‌তে টল্‌তে বাড়ি আসতো তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে! মা ও ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। নোরা জেগে বসে থাকতো বাপের জন্যে!

মাঝে মাঝে মদের ঘোরে চিৎকার করে উঠতো—সুগার নেই?

নোরা বলতো—না।

খাবার-দাবার ছুঁড়ে ফেলে এক লঙ্কাকাণ্ড বাধাতো তখন ব্যাণ্ড মাস্টার। চতুর্থপক্ষের স্বামী। সব তার হাতের কাছে জুগিয়ে দিতে হবে নোরাকে। ভয়ে বুক দুর-দুর করে কাঁপছে। পেছনের খিড়কি দিয়ে তখন পালিয়ে গেছে নোরা। ভিনসেণ্ট স্কোয়ারের রাস্তায় তখন লোক-জন নেই। সাদা সাদা পশমের মতন বরফ জমে আছে গাছ-পালার মাথায়। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে এক ধোপাদের বাড়ির উনুনের কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাকতো নোরা।

মা বলতো—তোকে কে বিয়ে করবে শুনি, কেউ বিয়ে

করবে না—আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবি তখন, তোর কপালে তাই-ই আছে!

ডোরা বলতো—আমি ইটালিয়ান বিয়ে করবো—ওরা খুব বউদের ভালোবাসে—লাভ করতে জানে—

নোরার মনে হতো—সেও যেন ইটালিয়ানকে বিয়ে করতে পায়। বরের কল্পনাটা মাঝে মাঝে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করে। রাস্তা দিয়ে বাজার করতে যাবার পথে হঠাৎ লম্বা লম্বা সোনালি চুলওয়ালা লোক দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইটালিয়ান হয়ত। রোম থেকে এসেছে। সিসিলি থেকে এসেছে! নানাভাবে তার দৃষ্টি নিজের দিকে আনবার ব্যবস্থা করে! নিজের ব্লাউজটাকে আরও এঁটে পরে, ফ্রকটা হাঁটুর ওপর তুলে দেয়।

রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ছোট আয়নাটা বার করে সাজে, ঠোঁটে একটু রঙ দেয়, ভুরু দুটো কলমের উল্টোদিক দিয়ে লম্বা করে টেনে দেয়। তারপর পাউডার দিয়ে মুখটা ঘষে ঘষে আরো লাল করে। নিজের মুখটাই নিজে বার বার দেখে আর নিজেই মোহিত হয়ে যায়। একবার দেখেও যেন আশ মেটে না। তারপর এমনি করে সেজেগুজে এক-সময়ে ন্যাকড়া দিয়ে সব মুছে ফেলে বিছানাটার একপাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আর তারপর ঘুম।

ডোরা বলতো—ওই ঘোড়াটার মাথায় যদি ঢিল মারতে পারিস তো এক শিলিং বাজি—

বুড়ো কসাই দূর থেকে দুজনকে দেখেই বলতো—দূর, দূর, দূর হ —আবার মাংস চুরি করতে এসেছে—

তা সেই মেয়েরই গায়ে একদিন মাংস লাগলো, গালে রঙ ফুটলো, চুলে ঢেউ লাগলো, চোখে ইশারা জাগলো। রাস্তার ছেলেরা শিস দেয় তাকে দেখে, বাপ মদ খেয়ে ভুল করে। মা চোখ বেঁকিয়ে চায়। আস্তে আস্তে কোমর আরো ভারী হলো, পিঠে খাঁজ পড়লো, ছটফটে মেয়ে চনমনে হয়ে উঠলো। বাপে-মায়ে একদিন তুমুল ঝগড়া!

মা বলে—তুমি বেরোও আমার বাড়ি থেকে—বেরিয়ে যাও—

বাপ বলে—তুমি বেরিয়ে যাও—

সে এক লঙ্কাকাণ্ড। লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলো নোরা। ভয়ে কথা বলবার সামর্থ্য নেই। বাপের সামনে আর বেরোতে ভয় করে। যদি মারে, যদি অত্যাচার করে!

এমন সময়ে এল অলক। অলোকেশ মিত্র। ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছে লণ্ডনে। বাপ তুলোর ব্যবসা করে। ইণ্ডিয়ায় বিরাট বাড়ি, চারখানা গাড়ি। ইণ্ডিয়ায় বউ হয়ে গেলে কিছুই কষ্ট নই। কেউ কাজ করতে বলবে না। শুধু বসে বসে আরাম করো। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বই পড়ো। আর ভাইবোনদের কে দেখবে? অন্ধ মাকে কে সেবা করবে? বাপের কথা আর বোল না—বুড়ো ব্যাণ্ড-মাস্টার স্মিথ তখন জেলে!

অলোকেশদা সকলকে বললে—আমার বাবার চারলাখ টাকার জমিদারি, তুলোর ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছে বাবা—আমার বাবা ইণ্ডিয়ার কটন্-কি—

আজ থেকে কতদিন কত বছর আগেকার সব ঘটনা। এ-সব আমার জানবার কথা নয়। আমার সাহেব-বৌদির এ পরিচয় আমি জানতামই না। সাহেব-বৌদির কয়েকটা চিঠি পেয়েই যেন নতুন চোখ দিয়ে দেখতে লাগলাম সাহেব-বৌদিকে। এমন করে সব মিথ্যেকথা বলেছিল আমাকে। সব উল্টো! পকেটে চিঠিগুলো নিয়ে সাহেব-বৌদির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাগলের মত ঘুরেছি!

সেদিন রাস্তায় ইউসুফ এসে ধরেছে আমায়।

বোধ হয় চিনতে পারে নি। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছনে লুঙ্গি-পরা লোকটা যেন কী বলতে বলতে আসছে মনে হলো। ফিরে দেখি সেদিনকার ইউসুফ।

ইউসুফ বলছে—খাঁটি বিলিতী বাবুজী, খাস লণ্ডন থেকে এসেছে, একেবারে আনকোরা—

বড় ঘেন্না হলো লোকটাকে দেখে। প্রথমে ভেবেছিলাম আমল দেব না। এমন পেশা ওদের। কিন্তু পকেটে হাত পড়তেই চিঠিগুলো ঠেকলো।

মনে পড়লো—উইলী লিখেছে—এবার ক্রীসমাসে আরো পাঁচশো পাউণ্ড পাঠাবে দিদি, এবার ম্যাটিল্ডার জন্মদিনে একটা ওভারকোট কিনে দিয়েছি, মাম্মি সেই রকমই আছে, একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, কিছু দেখতে পায় না, সারাদিন খিটখিট করে—তুমি আরো টাকা পাঠিও—

ইউসুফ আবার বললে—খাঁটি বিলিতী চীজ বাবু—খাস বিলেত থেকে আমদানি—

এবার ভালো করেই বুঝলাম আমাকে চিনতে পারেনি ও। আমাকে শিকার মনে করেছে। কিন্তু আমিও ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করলাম না। নতুন চীজের নানা গুণাবলীর বর্ণনা দিতে দিতে আমার সামনে-সামনে চলতে লাগলো। এ-রাস্তা পেরিয়ে ও-রাস্তা। অনেক রাস্তা অনেক গলি পেরিয়ে যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা সাহেব-বৌদির বাড়ির গেট।

সাহেব-বৌদি বলেছিল—এরা আমার প্রতিটি রক্ত-কণা নিয়ে ব্যবসা ফাঁদবে কে জানতো—তুই আমাকে এদের হাত থেকে বাঁচা ভাই—

তারপর বলেছিল—এই দেখ, আমার শরীরে আর রক্ত নেই কোথাও—ডাক্তার বসাক বলে, এ-রকম করে চললে আমি আর বাঁচবো না—

নেশার ঘোরে সুস্থ মানুষের কী-রকম অবস্থা হয় তা আমি জানি না। নিজে কখনও নেশা করিনি, কিন্তু তবু মনে হয়েছিল সাহেব-বৌদিরও যেন কোনও নেশা আছে। সে-নেশায় আচ্ছন্ন

হয়ে গেছি একেবারে! অথচ লৌকিক সম্পর্ক দিয়ে সে-নেশার কোনও অর্থ উদ্ধার করা যাবে না হয়ত। নিজের আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে নিজের লেখা-পড়া ছেড়ে দিনের পর দিন এক অনাত্মীয়া, অসম্পর্কীয়া বিদেশী নারীর মোহে দৌড়িয়েছি সে-কদিন। অনেকবার নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে সাহেব-বৌদি আমার কেউ নয়। অলোকেশদা মারা যাবার আগে যদিও কেউ হতো এখন আর কেউ ই নয়। এখন আবার নিজের স্বজাতিকে খুঁজে নিয়েছে সাহেব-বৌদি! নিজের আসল পথ বেছে নিয়েছে। এইটেই স্বাভাবিক, এইটেই সাহেব-বৌদির আসল রূপ। কিন্তু মানুষের মনকে বোঝানো যদি অত সহজ হতো তো ভাবনা ছিল না আর।

তাই চোখ বুজলেই কেবল দেখতে পেতাম লণ্ডনের রাস্তায় দুটি মেয়ে তাদের জীবনের সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে বেরিয়েছে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কোন্ জামা তাদের পছন্দ, কোন্ বর তাদের পছন্দ, কোন্ জুতো তাদের পছন্দ, তাই নিয়েই তারা মাথা ঘামায়।

ডোরা বলে—ওই দেখ, ওই জুতোটা আমার খুব পছন্দ—

নোরা বলে—দূর, ওর ষ্ট্র্যাপটা বড় মোটা!

তারপরে ডোরা বলে—ওই দেখ, ওই দাড়িওয়ালা রাশিয়ানটা আমাদের দেখছে—

ডোরা বলতো—তোর মটর চড়তে ভালো লাগে, না মটর সাইকেল?

নোরা বলতো—এই দেখ, এই মোজার দাম লিখেছে কিনা সাত শিলিং, এ কি ভদ্রলোক পরতে পারে?

সারা দুনিয়ার জিনিস পছন্দ করে বেড়ানোও একটা খেলা। নাই বা পেলাম হাতের মুঠোয়, না-ই বা থাকলো হাতে টাকা, পছন্দ কি অপছন্দ একটা ভিখিরীরও থাকতে পারে। পাঁচশো পাউণ্ড তোমায় কে আর দিচ্ছে। কে আর রাজপুত্র এক ইটালিয়ান এসে গলায় ফুলের মালা দিয়ে বরণ করছে। তোমার তেরোটা ভাই-বোন

আছে, তাদের ছেঁড়া জামা কাপড়, ময়লা প্যাণ্ট, আর সার্ট সাবান দিয়ে কাচতে কাচতে তোমার হাতে হাজা ধরে যাক না। স্বপ্নই যদি দেখতে হয় তো এক-পয়সার স্বপ্ন দেখবো কেন স্বপ্ন দেখবো লাখ টাকার! কল্পনায় যদি খেতে হয় তো পান্তভাত কে খেতে চাইবে, পোলাও খাবো!

সাহেব-বৌদি বলতো—শেষকালে যখন অলক এল, তখন মনে হলো—নাই বা পেলাম ইটালিয়ান—ইণ্ডিয়ার কটন-প্রিন্সকে তো পেয়েছি।

সাহেব-বৌদি বললে—জাহাজে ওঠবার সময় ডোরা এল আমাদের তুলে দিতে। ওর তখনও বিয়ে হয়নি—আমি ভাবলাম আমিই জিতেছি—ইণ্ডিয়ায় গিয়ে আমি রাণী হবো—রাণীসাহেবা হবো—

সাহেব-বৌদি বলেছিল—ইণ্ডিয়াতে পৌঁছেই চিঠি দিলাম ডোরাকে। লিখলাম—এখানে আমাকে সবাই রাণীসাহেবা বলে ডাকে—বিরাট প্যালেসে থাকি—আর রোজ পার্টি দিই, যত মহারাজা আর রাজা সে-পার্টিতে এসে আমার সামনে সোনা-রূপার জামা পরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে আমার হাতের উল্টো পিঠে চুমু খায়—

আজ এতদিন পরে কথাগুলো ভাবতে বেশ লাগে। সাহেব বৌদির সঙ্গে আর কোনওদিন কোথাও সাক্ষাৎ হবার ভয় নেই আজ। কিন্তু একজন মেয়ের উচ্চাভিলাষ কেমন করে কোথায় কতদূরে নেমে আসতে পারে তারই উদাহরণ সাহেব-বৌদি!

সবাই বলতো—এত দেমাক ভালো নয়—

যাব সিল্কের একটা গাউন জোটে না তারও দেমাক। পাড়ার ছেলেরা যারা শিষ দিত, গোপনে মিশতে চাইতো, বিয়ে করতে চাইতো, তাদের অমন করে অবজ্ঞা করা কি উচিত! ডাইং ক্লিনিং-এ ধোপার কাজ করতো জর্জি, হয়ত তাকে বিয়ে করলে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করতে হতো মার মতো। মাছের ব্যবসা করতো

মার্টিন। সে-ও রাজী ছিল বিয়ে করতে। কিন্তু তাতে তো আশা মিটবে না।

মনে আছে আবু পাহাড়ের উঁচু প্যালেসে বসে সাহেব-বৌদি বলেছিল—কাউকেই পছন্দ হলো না ভাই আমার, কেবল মনে হতো, যে-স্তরে আমি মানুষ তার চেয়ে উঁচুতে উঠবো! মাকে তো দেখেছি, একটার পর একটা বিয়ে করেছে আর কপাল চাপড়ে কেঁদেছে—মনে হতো যদি আমারও তাই হয়! তারপর কথা বলতে বলতে সাহেব-বৌদির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো।

বললে—অলক যা দিয়েছে আমায়, যত টাকা দিয়েছে হাতে, সব পাঠিয়েছি দেশে, বলেছি টাকার আমার শেষ নেই—তোমাদের যত টাকার দরকার সব আমি দেব, আমি রাণীসাহেবা হয়েছি, আমি সুখী হয়েছি, আমার অগাধ ঐশ্বর্য—আমার কিছুর অভাব নেই, আমি সোনার থালায় ডিনার খাই, রূপার বাটিতে কারি খাই,—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—এত টাকার তাদের কিসের দরকার?

সাহেব বৌদি ঘোমটাটা বাঁ হাতে সরিয়ে বলেছিল—তেরোটা ভাই বোন, তাদের সবাইকে মানুষ করতে হবে না? কেবল মনে হোত, তারা যেন আমার মত না কষ্ট পায়; তারা যেন গরম ভাত খেতে পায়, আলু খেতে পায়—তারা যেন বস্তিতে না থাকে, কোঠা বাড়িতে যেন আগুনের ধারে বসে গা-গরম করতে পারে, শীতের দিনে গরমমোজা পায়ে দিতে পায়,—

সাহেব-বৌদি বললে—সেই টাকা পেয়ে তারা বড় বাড়িভাড়া করলো, ভাই-বোনেরা ইস্কুলে ভর্তি হলো, মেজভাই হেনরি সাইকেল কিনলো, ক্রীসমাসে সবাই কেক খেতে পেল, মার বডিস হলো নতুন, ভাইরা চোর-বদমাশ হতো, তা আর হলো না—

বললাম—ওটা তোমার স্তোকবাক্য সাহেব-বৌদি!

সাহেব-বৌদি বলেছিল—কেন, আমি তো ওদের জন্যেই রোজগার করেছি—যখন আমার হাতে একটা পয়সা নেই, ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটে

নোংরা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থেকেছি, ইউসুফ আর আবদুলের হাতে ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে, ডাক্তার বসাক অত করে বললেও নিজের জন্যে ওষুধ কিনে টাকা নষ্ট করিনি, নিজের গাউন পর্যন্ত কিনিনি, ভাড়া নিয়ে নিয়ে চালিয়েছি—সে তবে কীসের জন্যে শুনি? ওদের ভালোর জন্যে নয়?

বললাম—না, ওদের ভালোর জন্যে মোটেই নয়।

মোটা সোফার গদির ওপর সাহেব-বৌদি তার ওড়না-শাড়ি-গয়না নিয়ে যেন সচকিত হয়ে উঠে বসলো। বললে—ওদের জন্য নয় তো কার জন্যে?

বললাম—সে তোমার নিজের জন্যে—তুমি স্বার্থপর! তোমার স্বার্থে তুমি সব করেছ—

সাহেব-বৌদি যেন অবাক্ হয়ে গেল। যেন এমন অসম্ভব কথা জীবনে কখনও শোনেনি। যেন নিজের মনের ভেতর তলিয়ে কখনও দেখেনি। সত্যিই মনে হলো সাহেব-বৌদি যেন এই প্রথম থামলো জীবনে। এই যেন প্রথম সম্বিত ফিরে পেল! এতদিন কেবল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে। পাথরের সাঁকোর তলায় সেই ঘৃণ্য জন্ম থেকে শুরু করে সেই যে একদিন ছুটতে শুরু করেছিল, মুচির মেয়ে, ধোপার মেয়ে, ফেরিওয়ালার মেয়ে, ব্যাণ্ড মাস্টারের মেয়ে হয়ে কতদূর ছুটতে হয়েছে তাকে। কত দীর্ঘপথ! এখানে নয়, এখানেও নয়। অন্য কোথাও। অন্য কোনও সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ! যেখানে গেলে কোনও অপমৃত্যু কেউ লেলিয়ে দেবে না পেছনে। এমন একটা সংসার যেখানে স্বামীকে স্ত্রী শ্রদ্ধা করে, স্ত্রীকে স্বামী ভালবাসে। এমন কোনও পরিবেশ যেখানে সন্তানের জন্ম অভিশাপ নয়—উৎসব। যেখানে পুত্র-কন্যা ঈশ্বরের আশীর্বাদ! তাই তো শো-কেস-এর মোজা দেখে দীর্ঘশ্বাস পড়েছে, দামী মটর-গাড়ির আরোহীকে আকর্ষণ করতে চেয়েছে রূপ দিয়ে যৌবন দিয়ে ধনী-পুরুষকে প্রলোভিত করতে চেয়েছে—আর দিনের-পর-দিন নিজেকে

ঘৃণা করতে শিখেছে। ধোপার ছেলে জর্জি, জেলের ছেলে মার্টিন, ওরা তো তারই সমগোত্র! তাতে আর মুক্তি কোথায়! তাই কেবল লণ্ডনের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে রূপকথার প্রিন্সের সন্ধানে ঘুরেছে আর রূপকথার প্যালেসের স্বপ্ন দেখেছে!

বললাম—তুমি টাকা পাঠিয়েছ ভাইবোনদের—সেও তোমার এক রকম স্বার্থপরতা!

সাহেব-বৌদি বলতে লাগলো—আর টাকা কি একটা রে! অলক আমায় টাকা দিত—নিজের জন্যে আমি তা কিছু রাখতাম না—অলক কিছু বলতো না আমাকে, এতো ভালবাসতো, কী বলবো! কে জানতো অমন করে একদিন হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটবে!

তারপর আবার থেমে বলতে লাগলো—আর যখন হোটেলের বারে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলাম—মনে আছে টাকার তখন পাহাড় হয়ে গেছে, নেভি আর আর্মির লোকেরা আমায় টাকায় ডুবিয়ে দিয়েছে—কিন্তু নিজে সে-টাকা খরচ করতে গেলেই খচ খচ করে বাজতো বুকে—

বললাম—কিন্তু কার জন্যে এত করেছ তুমি সাহেব-বৌদি! নিজের মনের কাছে তুমি মিথ্যে বলো না, তোমার পাপ হবে!

সাহেব-বৌদি অবাক্ হয়ে গেল। বললে—এ-ও কি আমার স্বার্থপরতা বলতে চাস্?

বললাম—নিশ্চয়! তুমি তোমার ভাইদের, বোনদের, বন্ধুদের, পাড়াপড়শীদের জানাতে চেয়েছিলে যে তুমি বড়লোক, তোমার অনেক টাকা! তুমি রাণী! তুমি রাণীসাহেবা!

কথাগুলো শুনে সাহেব-বৌদি যেন গুম হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ কোনও কথা কইতে পারলো না। বাইরে সান্-সেট পয়েন্ট-এর দিক থেকে আলোটা সোজা-সুজি এসে হাওয়া-মহলে পড়েছে।

সাহেব-বৌদি বললে—আমার সব গুণ দেখছি দোষ হয়ে গেল

আজ ! কত অত্যাচার করেছি নিজের শরীরের ওপর রাত জেগে জেগে, যে-এসেছে কাউকেই না বলে ফিরিয়ে দিইনি। রাত দুপুরেও যদি ইউসুফ এসে বলেছে—এক মহারাজা এসেছে, তো রাজী হয়ে তার গাড়িতে গিয়ে উঠেছি, ভেবেছি এ তো আমার নিজের স্বার্থের জন্যে করছি না, ভাইবোনদের মানুষ করবার জন্যে করছি—এতে কোনও দোষ নেই—

বললাম—সে আমি জানি সাহেব-বৌদি—

সাহেব-বৌদি বললে—তুই আর কতটুকু জানিস্ আর কতটুকু জানা সম্ভব তোর পক্ষে—

বললাম—তবুও আমি যা জানি, তুমি নিজেও তা জানো না—কতদিন তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরেছি, তোমাদের ফ্ল্যাটের গায়ে ইঁটের ফাঁকে অশথের চারা গজিয়েছে, তোমার বাড়ির ছাদে একটা কাক এসে উড়ে বসেছে, তোমার রেলিংএ ভিজে পেটিকোট শুকোচ্ছে, আমি অফিস কামাই করে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখেছি শুধু—

সাহেব-বৌদি বললে—আমায় ডাকিস্‌নি কেন ?

বললাম—তুমি কি তখন এই রকম ছিলে সাহেব-বৌদি ? একদিন তোমার ইউসুফই আমায় রাস্তায় ধরলো—নতুন চিজ বিলেত থেকে আমদানি—অনেক কথা বলতে বলতে আমার পেছু নিলে—

সাহেব-বৌদি খুব হাসতে লাগলো। বললে—তারপর !

—তারপর কি মনে হলো ! সন্দেহ হলো হয়ত তোমার কথাই বলছে, তোমারই রূপের বর্ণনা করছে, তোমারই দালাল—লোভও হলো তোমাকে দেখবার। তখন তোমাকে দেখতে যে আমার কী লোভ ছিল কী বলবো !

সাহেব বৌদি বিশ্বাস করতে চাইলো না। বললে—আমাকে দেখতে তোর এত লোভ ছিল ? এত লোভই যদি ছিল তো এলেই পারতিস্—কে বাধা দিত ?

বললাম—সে তুমি বুঝবে না সাহেব-বৌদি! তুমি তো মধ্যবিত্ত সংসারে লাজুক ছেলে হয়ে জন্মাওনি—নিজের মনের কথা কাউকে বলবার লোক পেতাম না, বাবার কাছেও না। আমার কোনও বন্ধুবান্ধবও তখন ছিল না—যখন অলোকেশদা' মেম-সাহেব বিয়ে করে আনলো, তখন সবাই কত টিটকিরি দিয়েছে! কিন্তু সে-টিটকিরি তো তোমার কানে পৌঁছোয়নি, সব আমার বুকে বেজেছে এসে, তখন সেই ছেলে-বয়েসে যদি কাউকে প্রাণ ঢেলে ভালোবেসে থাকি, সে শুধু তোমাকে!

সাহেব-বৌদির কাছে কথাগুলো যেন নতুন ঠেকলো! আশ্চর্যও হয়ে গেল কম নয়। বললে—সত্যি? তাই নাকি? আমাকে বলিস্‌নি তো তুই?

বললাম—ভালোবাসা কি মুখ ফুটে বলার জিনিস?

তারপর বললাম—আমি তোমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছিলুম, মনে আছে?

সাহেব-বৌদির কিছুই মনে নেই। বললে—কবে?

বললাম—সে কথা তো তোমার মনে থাকবার কথা নয় সাহেব-বৌদি, তোমার পা জোড়া নিয়ে কোলে করে থেকেছি কতক্ষণ, মনে হয়েছে এ-আলতা পরানো যেন আমার জীবনে শেষ না হয়!

বললাম—আমার সে-সব কথা সব মনে আছে বৌদি, কিছু ভুলতে পারিনি—

সাহেব-বৌদি বললে—কি করে মনে থাকবে বল্—ইণ্ডিয়াতে তখন সবাইকে আমি বলে বেড়াচ্ছি—লণ্ডনে আমরা খুব বড়লোক ছিলাম, আমাদের গাড়ি আছে, আর লণ্ডনে চিঠিতে লিখতাম এখানে আমি খুব সুখে আছি—তোর কথা কি তখন ভাববার সময় ছিল?

বললাম—তারপর যেদিন তুমি চলে গেলে বাড়ি ছেড়ে? কাউকে বলে গেলে না, সেদিনও কি কম কেঁদেছিলাম?

সাহেব-বৌদি বললে—কেঁদেছিলি? কিন্তু তুই তো তখন খুব ছোট রে?

বললাম—ছোট হলে কি হবে, আমি তোমাকে আমার মা'র চেয়েও ভালবাসতাম! মনে হ'ত মা যেমন আমায় আদর করে, তুমি যদি আমায় তেমনি আদর করতে, তেমনি করে চুমু খেতে তো আরো ভালো লাগতো!

সাহেব-বৌদি এবার একটা সিগারেট ধরালে। সোনার পাইপে সাদা সিগারেটে আগুন জ্বলে উঠলো। সে-আগুন সাহেব-বৌদির কানের হীরের ঝুমকো আর নাকের হীরের নাকছাবি ঝকমক করে উঠলো। দূরে একটা গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো অনেকবার। সাহেব-বৌদি সামনের গেলাসে আর একবার চুমুক দিলে।

সাহেব-বৌদি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—তুই আমাকে অবাক্ করলি—তুই আমাকে এত ভালোবাসতিস্! তোর তো বয়েস তখন খুব ছোট!

বললাম—তা বলে ছোট ছেলেরা কি বুঝতে পারে না মনে করেছ,—ছোটরা কি ভালোবাসতে পারে না? অলোকেশদা' যখন তোমাকে চুমু খেত, আমি কিছু বুঝতে পারতাম না ভেবেছ?

সাহেব-বৌদি শুধু বললে—আশ্চর্য!

বললাম—তুমি আশ্চর্য হচ্ছো সাহেব-বৌদি, কিন্তু আমি আশ্চর্য হইনি—আমি শুধু আশ্চর্য হয়েছিলুম সেইদিন যেদিন অলোকেশদা' মারা যাওয়ার পরও তুমি বিলেত চলে গেলে না—কলকাতাতেই বাড়ি আঁকড়ে পড়ে রইলে—বিধবার পোশাক পরলে, একাদশী করলে, পূর্ণিমে করলে—আর থান কাপড় পরে মাথার সিঁদুর মুছে, চুল ছোট করে ছেঁটে ফেললে—

সাহেব-বৌদি গেলাসে আবার চুমুক দিয়ে বললে—তখন আমার ভারি অহঙ্কার ছিল, জানিস্—

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম—অহঙ্কার!

সাহেব-বৌদি বললে—এখনও আছে, কারো কাছে হার মানতে আমার মাথা কাটা যায় এখনও! লণ্ডনে ডোরার কাছে তাইতো খালি বাজি রাখতুম, পাড়াপড়শীর কাছে নিজের দারিদ্র্যের লজ্জা আমি সইতে পারতুম না—তাই তো নিজের গোঁতে ইণ্ডিয়ায় চলে এলাম!—

বললাম—কিন্তু অলোকেশদা'কে তুমি কী করে সহ্য করতে পারলে সাহেব-বৌদি? অলোকেশদা' তো তোমায় ঠকিয়েছে!

সাহেব-বৌদি বললে—না রে, অলক্ আমায় ঠকায়নি, আমিই বরং ঠকিয়েছি অলককে—

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম—সে কি? অলোকেশদা'ই তো নিজেকে বড়লোক বলে পরিচয় দিয়েছে, বলেছে বাবার জমিদারী আছে। বলেছে ওর বাবা কটন্-কিং?

সাহেব বৌদি বললে—না—

বললাম—তা হলে?

সাহেব-বৌদি বললে—অলক আমাকে বলেছিল ওর আসল অবস্থার কথা, নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, যদি ব্যারিস্টারি পাশ করে ভালো প্র্যাকটিশ না হয় তো কষ্ট হবে আমার, বলেছিল মেম-সাহেব বিয়ে করে নিয়ে গেলে বাপ-মা মনে কষ্ট পাবে, খুব সরল ছেলে অলক, কোনও কথা ও গোপন করেনি আমার কাছে—

বললাম—বলছো কি সাহেব-বৌদি, অলকেশদা' সত্যিই তোমায় ঠকায় নি?

সাহেব-বৌদি আবার সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লে। বললে—সত্যিই ঠকায়নি, আসলে আমিই ঠকিয়েছি ওকে—আসলে আমিই ওকে সকলের কাছে বড়লোক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছি। সকলকে বলেছি ওর বাবা কটন্-কিং, ও হলো কটন-প্রিন্স—বলেছি আমি ইণ্ডিয়ায় গিয়ে রাণী হবো—

অবাক্ হয়ে গেলাম সাহেব-বৌদির কথা শুনে।

বললাম—কিন্তু কেন ?

সাহেব-বৌদি বললে—বলেছি তো, আমি সকলকে ঘেন্না করতাম, যারা আমার চারপাশে থাকতো সকলকে ঘেন্না করতাম! আমার বাবাকে, আমার মাকে, আমার ভাইবোনদের—

—ভাই-বোনদেরও ? যাদের তুমি এত হাজার-হাজার টাকা পাঠিয়েছ ?

সাহেব বৌদি বললে—হ্যাঁ, তাদের অপরাধ তারা গরীব, কেন তারা জন্মেছে, কেন তাদের টাকা নেই, কেন তারা লেখা-পড়া শিখতে পায় না, কেন তারা বস্তিতে নোংরা হয়ে থাকে,—আর আমি ? নিজেকেও কি আমি কম ঘেন্না করতাম রে ?

আমি চুপ করে রইলাম। আবু পাহাড়ের ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে। ফতেগড়ের বড়ে মহারাজার প্রাসাদে বসে সেদিন সাহেব-বৌদির সেই কথাগুলো যেন আজো কানে শুনতে পাচ্ছি। যে-মানুষ ছোটবেলা থেকে মানুষের ঘৃণা পেয়েছে আর মানুষকে ঘৃণা করেছে কেবল, তার এই ঘৃণ্য জীবন যাপন যেন আর আমার কাছে আশ্চর্য লাগলো না! যেন সেদিন প্রথম ক্ষমা করতে পারলুম সাহেব বৌদিকে। সাহেব-বৌদি ঘন-ঘন গেলাসে চুমুক দিচ্ছে আর এক নিমেষে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা।

সাহেব-বৌদি বললে—মনের ঠিক এই অবস্থায় এল অলক—ইটালিয়ান নয়, ইণ্ডিয়ান—

অলক বললে—কিন্তু আমাকে বিয়ে করলে তোমার কষ্ট হবে খুব নোরা—

আমি বললুম—তোমাকে বিয়ে না করলে আমার আরো কষ্ট হবে অলক, আমি লণ্ডন ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে চাই—আমাকে খেতে দিও না, পরতে দিও না, শুধু সঙ্গে যাবো—

অলক বললে—বাবার মনে বড় কষ্ট হবে, আমার ওপর তাঁরা অনেক আশা রাখেন—

আমি বললাম—তুমি যা করতে বলবে তাই করবো, আমি হিন্দু ঘরের বউ হবো, যেমন করে তোমাদের দেশের বউরা থাকে, তেমনি করে থাকবো—আমি এখানে আর থাকতে পারবো না—আমাকে বাঁচাও তুমি—

পার্কের বেঞ্চিতে বসে আমি অলককে অনেক বোঝালুম। বাড়ির আবহাওয়া আমার কাছে বিষ মনে হতো, বাড়ির কথা মনে হলেই সমস্ত শরীর মন বিষিয়ে উঠতো! ভাইরা চোর হয়ে উঠেছে, বোনেরা বড় হলে হয়ত আমার মত হবে ভেবে রাত্রে ঘুম হতো না, তারপর সারাদিন আমার সেই রাস্তায় টো টো করে ঘোরা আর দোকানের শো কেস দেখে দেখে বেড়ানো, আর ঘুম আসবার আগে ইটালিয়ানের স্বপ্ন দেখা—

অনেকক্ষণ ধরে শুনতে লাগলাম সাহেব-বৌদির কথাগুলো।

বললাম—তোমার মত এত সুন্দর মেয়ে—তোমারও বিয়ের ভাবনা?

সাহেব-বৌদি বললে—আমাদের দেশে গরীবের কোনও জাত নেই—সুন্দরী হলেও না—

সাহেব-বৌদি আবার বলতে লাগলো—আমি অলককে বললাম, তোমাকে আমি বড়লোক বলে প্রচার করবো—তুমি না বলতে পারবে না—

অলক বললে—কিন্তু সত্যিই যে আমি বড়লোক নই, আমার একখানাও মটর নেই—থাকবার মধ্যে শুধু একখানা বাড়ি, তাও গলির ভেতরে—

সাহেব-বৌদি বললে—হোক গলির ভেতরে—তুমি 'না' বলতে পারবে না—

সেই তখন থেকে অলক হলো প্রিন্স। অলক হলো জমিদারের ছেলে। অলকের বাবা হলো কটন-কিং, অলকের চারখানা গাড়ি আছে, ইণ্ডিয়াতে বিরাট প্যালেস। অলকের সঙ্গে যেতাম থিয়েটারে,

যেতাম সিনেমায়, যেতাম নাচে। আমার গায়ে সিল্কের গাউন উঠলো, আমি ইণ্ডিয়ার রাণী, রাণীসাহেবা, আমাকে সবাই হিংসে করতে লাগলো, আমার বাবা মা পাড়াপড়শী, আর সকলের চেয়ে ডোরা—সে যে আমার কী আনন্দ সে তুই বুঝবি না—

বললাম—সে আমি জানি—

সাহেব-বৌদি গেলাসটা ঠক্ করে নামিয়ে দিলে টেবিলের ওপর। বললে—জানিস্ তুই সব ? কী করে জান্‌লি ?

বললাম—এই নাও তোমার চিঠি—

—এ চিঠি কোথা থেকে পেলি ?

বললাম—সব আমি পড়েছি, তুমি আমায় এতদিন মিথ্যে কথা বলেছ, এত ঠকিয়েছ আমাকে, তা এই চিঠি পড়েই বুঝলাম—মনে যে কী কষ্ট হলো তা তুমি বুঝবে না সাহেব-বৌদি, এই চিঠিগুলো নিয়ে সারাদিন ঘুমিয়েছি, যেখানে তোমার নাম লেখা আছে সেইখানে বার-বার চুমু খেয়েছি। মনে হয়েছে তোমার সঙ্গে দেখা করি। দেখা করে তোমাকে চিঠিগুলো দিয়ে কৈফিয়ত চাই। বলি, কেন তুমি আমার কাছে এমন করে মিথ্যে কথাগুলো বললে ?

সাহেব-বৌদিও খানিক চুপ করে রইল।

—শুধু কি তোকেই মিথ্যে কথা বলেছিলাম ? সারা ভিন্‌সেণ্ট স্কোয়ারের লোককে যে ঠকিয়েছিলুম আমি! সমস্ত লোককে জানিয়েছিলুম আমি ইণ্ডিয়াতে এসে রাণী হয়েছি, আমার দশটা আয়া, চল্লিশটা খানসামা, বিরাট প্যালেস আমার—শেষে অলক যখন মারা গেল, আমি এত বড় স্বার্থপর, এত বড় মিথ্যেবাদী, এত বড় ভণ্ড, কখনও অলকের জন্যে কাঁদিনি, কেঁদেছিলাম আমার সমস্ত প্রবঞ্চনা দেশের লোকের কাছে ধরা পড়ে যাবে বলে—তাই তো আর বিলেতেও ফিরে যেতে পারিনি—তাই তো আমার টাকা দেখাবার জন্যে হাজার-হাজার টাকা দেশে পাঠিয়েছি—

বললাম—তা-ও আমি জানি—

সাহেব-বৌদি বললে—কী করে জান্‌লি ?

বললাম—তোমার ভাই-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—

—সে কী ? সাহেব-বৌদি হুইস্কির গেলাসটায় চুমুক দিতে গিয়েও যেন দিতে পারলে না। গীর্জার ঘড়িতে তখন আবার ঢং ঢং করে অনেকগুলো ঘণ্টা বাজতে লাগলে পর পর।

আজো মনে আছে সে-সব কথা।

ইউসুফ আমাকে নিয়ে তর্ তর্ করে সাহেব বৌদির ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু ওপরে গিয়ে দেখি সাহেব-বৌদির ঘরে তালাবন্ধ। ইউসুফ হয়ত অবাক্ হয়েছিল, কিন্তু অবাক্ আমি হইনি। যাকে টাকা উপায়ের পথ অতিক্রম করতে হয় নানাভাবে, তার সময়-অসময় থাকে না জানতাম। জানতাম সাহেব বৌদি গোগ্রাসে অর্থ, ঐশ্বর্য গিলছে। পকেটের চিঠিতেই তার প্রমাণ পেয়েছি। বুঝেছিলাম টাকার প্রয়োজন তার নিজের ছিল না বটে কিন্তু দেশের ভাইবোনেরা হাঁ করে বসে থাকে তার টাকার জন্যে। তাদের দিদির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ইণ্ডিয়ান প্রিন্সের, অধিকার আছে বৈকি তাদের টাকা চাইবার।

দিদি চিঠি লিখেছে এখান থেকে—ভিন্‌সেণ্ট স্কোয়ার ছেড়ে লিস্টার স্কোয়ারে বাড়িভাড়া করবি,'আরো টাকা পাঠালাম, এ-দিয়ে হেন্‌রির গ্যাবার্ডিনের স্যুট হবে, মার্টিনের ট্রাইসাইকেল, উইলীর স্কুলের ফিস্, আর মিমির ফ্রক স্যুট্, মার ওষুধ আর গলার নেকলেস, লেনীর প্যারামবুলেটর আর কেটির পুতুল ইত্যাদি ইত্যাদি—

ভিন্‌সেণ্ট স্কোয়ারের সবাই একদিন ঘুম থেকে উঠে জানতে পারলো মাতাল ব্যাণ্ড-মাস্টারের বড় মেয়ে নোরা স্মিথ এনগেজ্‌ড্ হয়েছে এক ইণ্ডিয়ান প্রিন্সের সঙ্গে —

বুড়ি ধোপানী মার্গারেট একদিন এসে বললে—হ্যাগো, যা শুনছি সত্যি ? আহা তোমার মেয়ে বেঁচে বর্তে থাক—

মেছুনি বুড়ী হাডসন্ গিন্নী এসে বললে—এবার তোমাদের অবস্থা ফিরলো তা হলে বলো ?

মুদী আবার ধার দিতে লাগলো। মাংসওয়ালা আবার দেখা হলে গুড্ মর্নিং মিসেস···বলে অভ্যর্থনা করতে লাগলো। আবার পাশের বাড়ির পার্টিতে নেমন্তন্ন হতে লাগলো ভাই-বোনদের।

কিন্তু সবাই জিজ্ঞেস করে—কিন্তু কী করে পাকড়াও করলে গা। প্রিন্সকে ?

রূপ অবশ্য আছে নোবার। গালের রঙ আছে, পিঠের খাঁজও আছে, গায়ে মাংসও আছে, মাথায় সোনালী চুলও আছে। আছে পুরুষ মজাবার সব গুণ! কিন্তু তবু তো প্রিন্স! তবু তো অনেক টাকার মালিক!

এক ডোরা ছাড়া কেউ জানে না কী করে হ'ল।

সে এক মজার কাণ্ড!

রাস্তা দিয়ে চলেছে দু'জনে। শো-কেস-এর জামা, মোজা, গাউন দেখতে দেখতে। হঠাৎ একটা বিরাট গাড়ি এসে দাঁড়ালো একটা বিরাট দোকানের সামনে। ভেতরে এক ইটালিয়ান। চমৎকার জোয়ান চেহারা। সরু একটা গোঁফ ঠোঁটের দু'পাশে। ইটালিয়ানটা নামলো গাড়ির দরজা খুলে।

ডোরা বললে—ওকে গিয়ে আচমকা চুমু খেয়ে চমকে দিতে পারিস্ তুই নোরা ?

চেনা নেই, শোনা নেই, নাম ধাম জানা নেই, এ কী রকম রসিকতা!

তা হোক! সে সব দিনের কথাই আলাদা। তখন স্বপ্ন দেখে নোরা ইটালিয়ানের, তখন নিজের সমস্তরের লোকদের ঘৃণা করে, তখন মনে হয়, আশে পাশের সবাই যেন পাপ। ভাইবোনরা পয়সার জন্যে লেখা-পড়া করতে পারে না। ব্যাণ্ড-মাস্টার মদ খেয়ে এসে সুগার না পেয়ে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসে। কেমন করে মুক্তি

পাওয়া যায় সমস্ত কলঙ্ক থেকে, সমস্ত কদর্য পরিবেশ থেকে! তখন অন্য কোন উপায় না পেয়ে জীবন, যৌবন, প্রাণ, মন নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে নোরার বয়েসী সব পাড়ার মেয়েরা।

নোরা বললে—হ্যাঁ চুমু খেতে পারি, কত বাজি?

ডোরা বললে—এক শিলিং!

তা এক শিলিংই সই। কিন্তু ততক্ষণে ইটালিয়ানটা দোকানে ঢুকে গেছে। দোকান থেকে যেই বেরোবে তখনই হবে। নোরা আর ডোরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বড় গেটটার আড়ালে। এক একবার উঁকি মেরে দেখছে। এই বুঝি আসে! একবার এসে রাস্তা পেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলে আর হবে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একবার মনে হ'ল এইবার বুঝি আসছে ইটালিয়ানটা! নোরা রেডি হয়ে রইল। তারপর যেই দোকান থেকে বেরিয়েছে অমনি লাফিয়ে গিয়ে নোরা চুমু খেয়েছে ইটালিয়ানটাকে।

লোকটাও কম অবাক্ হয়নি।

কিন্তু আরো অবাক্ হয়েছে নোরা। এ সেই ইটালিয়ান নয়, এ ইণ্ডিয়ান! অলক মিত্তির! বাবার জমানো টাকা খরচ করে বিলেতে এসেছে ব্যারিস্টারি পড়তে!

তা হোক ইণ্ডিয়ান। হোক গরীবের ছেলে! সেই থেকেই আলাপ হ'ল দুজনের।

দুজনে গিয়ে রেঁস্তোরায় বসে কফি খায়।

নোরা বলে—তুমি প্রিন্স আর প্রিন্সেস—

অলক লাজুক ছেলে। বলে আমি গরীব লোক, বাবার সামান্য টাকা আছে, তাই বিলেতে এসেছি—

নোরা বলে—না ও-কথা কাউকে বলতে পারবে না, তোমার অন্য পরিচয় আমি দেব সকলকে—

নোরা যেখানে যায় পরিচয় করিয়ে দেয়—কটন প্রিন্স অব ইণ্ডিয়া—

সাহেব-বৌদি বলেছিল—মনকে চোখ ঠারা বলে তোদের বাঙলায় সেই যে একটা কথা আছে, সেই থেকেই আমার তাই শুরু হ'ল। সেই থেকে শুরু করে একটার পর একটা কেবল মনকে চোখ ঠেরে এসেছি। সুলতানগঞ্জের ছোট প্রিন্সকেও পেলাম একদিন। সত্যিকারের প্রিন্স। চেহারায় যেমন গ্রিসিয়ান কাট তেমনি অগাধ টাকা। তাকে তুই দেখিস নি—

বললাম—দেখেছি—

মনে আছে সাহেব বৌদির ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের দরজা তালাবন্ধ দেখে আস্তে আস্তে নেমে আসছি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। খাঁচার ক্যানারী পাখীগুলো কিচ কিচ করছে। উঠোনে হাঁসের দল প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলো।

ইউসুফ বললে—আর একটু দাঁড়ান বাবুজী, মিসি-মাযি এখুনি আসছে—

কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে যখন এলো না তখন চলে আসছি, হঠাৎ বাইরে মটরের শব্দ হ'ল। আড়ালে লুকোতে যাচ্ছি, হঠাৎ সামনে এসে পড়লো সাহেব বৌদি। সাহেব বৌদির পোশাক দেখে আমি চমকে গেলুম। পুরুষের মত আট ট্রাউজার পরেছে, ঢিলে সিল্কের সার্ট, কলার তোলা ঘাড়ের ওপর, আর চুলগুলো পুরুষের মত ছাঁটা!

সাহেব বৌদি বললে—কথা ছিল ছোটকুমার সাহেব আমায় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলবে কিন্তু নিয়ে তুললো গিয়ে তার বাগান-বাড়িতে—

সমস্ত রাত মটর ছুটেছে। কলকাতা পেরিয়ে যশোর রোড ধরে সোজা চললো গাড়ি। বাইরে চাঁদ উঠেছে, অবসন্ন হয়ে আসছে শরীর। সুলতানগঞ্জের ছোটকুমার সাহেব মটর চালাতে চালাতে এক জায়গায় এক গাছের তলায় এসে গাড়ি থামালো।

সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললে—খাও, সিগারেট খাও নোরা—

আমি বললাম—সিগারেটে পেট ভরবে না আমার—

কুমার সাহেব বললে—কীসে পেট ভরবে তোমার শুনি ?

বললাম—টাকায় !

—কত টাকায় ?

বললাম—মাসে দশ হাজার টাকা ! অল ফাউণ্ড—

কুমার সাহেব তাইতেই রাজী। সাত লাখ টাকা কুমারের জমিদারীর আয়। হাত খরচই তিন লাখ। কোন্ ফুটো দিয়ে কোথায় কত টাকা বেরিয়ে যায় কে জানে ! আজ পার্টি, কাল নাচ, পরশু পিকনিক। আর নাচতে হয় না হোটেলের বার-এ। আর উপোস করতে হয় না। আর গাউন ভাড়া করে জুতো গয়না ভাড়া করে টাকা জমাতে হয় না। ইউসুফ আর আবদুল মিয়ার অত্যাচার সইতে হয় না। গায়ে আরো মাংস লাগলো। পিঠের খাঁজ আরো স্পষ্ট হ'ল। ছোটকুমার সাহেবের সঙ্গে যখন বেরোই, হোটেলে লাঞ্চ খাই, ডিনার পার্টিতে যাই, সবাই চেয়ে দেখে। আর আমি আমার লণ্ডনের দিনগুলোর কথা ভাবি। কেটিব কথা ভাবি, ম্যাগির কথা ভাবি, মা, ভাইবোন, ডোরা, পাড়ার লোকজন সকলের কথা ভাবি। সকলকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে হয়। দেখো, এবারে সত্যিকারের রাণী হয়েছি, সত্যিকারের সুয়োরাণী হয়েছি, সত্যিকারের প্রিন্সেস হয়েছি—। আর উড স্ট্রিটের ফ্ল্যাট বাড়িতে ছোটকুমার সাহেব আসে আর টাকার আর মদের ফোয়ারা খুলে যায়—

মনে আছে সাহেব-বৌদিকে দেখেই আমি আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি। সাহেব-বৌদি তর তর করে ওপরে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। সুলতানগঞ্জের ছোট কুমার সাহেব গাড়িতে বসে ছিল। চমৎকার চেহারা। সত্যিই যেন ইটালিয়ান প্রিন্স। গাড়িটা একটা মৃদু আর্তনাদ করে কোথায় চলে গেল। আমি ইউসুফের আহ্বান অগ্রাহ্য করেই চলে এলাম।

সেদিন যে সাহেব-বৌদির সঙ্গে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দেখা করিনি সে কি

রাগে না হিংসেতে! রাগ কেন তা-ও জানি না। সাহেব-বৌদির ওপর আমার রাগ করবার অধিকারই কি আছে নাকি—মিথ্যে কথা বলেছিল বলে? মিথ্যেকথা বলবে সাহেব-বৌদি তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে! আর হিংসে! সুলতানগঞ্জের ছোট কুমারসাহেবের ওপর হিংসে করবো এমন সামর্থ্য আমার আছে নাকি! মনে হলো চিঠিগুলো সমস্ত ছিঁড়ে ফেলে দিই! কিন্তু একদিন তো সাহেব-বৌদি আমাকে আদর করতো, একদিন সাহেব-বৌদি আমাকে আদর করে চকোলেট এনে দিয়েছে—সে কথা কেমন করে ভুলতে পারি!

তখন অনেক সহ্য হয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে আসছি একলা। হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে কেমন অবাক্ লাগলো। মিলিটারি পোশাক-পরা একজন কে যেন আমাদের বাঙালী পাড়ায় ঘুরছে। চোখোচোখি হতেই আমায় জিজ্ঞেস করলে—বাবু, প্রিন্সেস নোরা মিত্র কোন্ বাড়িতে থাকে বলতে পারো?

বললাম—কে তুমি? কোথা থেকে আসছো?

বললে—প্রিন্সেস্ আমার বড়দি, আমি যুদ্ধে ডাক্তার হয়ে এসেছি—এখানে আমার দিদির সঙ্গে এক প্রিন্সের বিয়ে হয়েছে—

বললাম—প্রিন্স?

একবার বলতে যাচ্ছিলাম—সব মিথ্যে কথা! সুলতানগঞ্জের প্রিন্সের কথাও বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। লোকটার আপাদমস্তক ভালো করে দেখলাম। মুখের চেহারা অবিকল সাহেব-বৌদির মত। মেয়ে হলে সাহেব-বৌদি বলেই ভুল করা চলতো! তেমনি মিষ্টি, তেমনি নরম। বয়েস বেশি নয়।

বললাম—নোরা মিত্র আমার বৌদি, অলোকেশ মিত্তির ব্যারিস্টারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, আমি সাহেব-বৌদি বলেই ডাকতাম তাকে,···ওই যে ওই বাড়িটা; কিন্তু···

আবার বললাম—তোমার নামটা কী ?

বললে—উইলিয়াম কার্লাইল্ স্মিথ—সবাই আমাকে উইলী বলে ডাকে—

একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসলাম সাহেব বৌদির ভাইকে নিয়ে !

মনে আছে সেই দিনই সাহেব-বৌদির বাড়ির কথা অনেক শুনে-ছিলাম। ক'ভাই, ক'বোন, মা অন্ধ হয়ে পড়ে আছে, বাবা জেলে গেছে খুনের অপরাধে। ভিন্‌সেণ্ট স্কোয়ারের বাড়ি ছেড়ে লিস্টার স্কোয়ারে মস্ত বড় বাড়ি কিনেছে তারা। সব সাহেব-বৌদির পয়সায়। দিদির অনেক টাকা। মাসে মাসে অনেক টাকা পাঠাতো বাড়িতে, তাইতেই ভাইরা বোনরা মানুষ হয়েছে। লেখা-পড়া শিখেছে। ম্যাগির বিয়ে হয়েছে এক কর্নেলের সঙ্গে। কেটি এখন এন্‌গেজড হয়েছে এক ডাক্তারের সঙ্গে। মিমি ভালো ভায়োলিন বাজাতে শিখেছে। এবার সার্টিফিকেট পেয়েছে ভায়োলিন বাজিয়ে। হেনরি ঢুকেছে নেভিতে! সবাই মানুষ হয়েছে শুধু দিদির টাকাতে! দিদির তো অনেক টাকা!

সাহেব-বৌদির ভাই বললে—দিদিই বলেছে, আর টাকা না থাকলে অত টাকা মাসে মাসে পাঠাবে কী করে? পাড়ায় যারা আমাদের একদিন দেখতে পারতো না—তারাই এখন খাতির করে, ম্যাটিল্ডাকে বিয়ে করতে চায় বড়-বড় ফ্যামিলির ছেলেরা—

মনে হলো দিদির রক্ত জল করা টাকায় অন্তত কতকগুলো ছেলে-মেয়েতো মানুষ হয়েছে! একটা সংসারে তো সুখ এসেছে, শান্তি এসেছে! হোক না সাহেব-বৌদির যক্ষ্মা! মুখ দিয়ে হয়ত রক্তও উঠেছে। ডাক্তার বসাকের সব ওষুধ হয়ত কৃপণতা করে খায়নি। হয়ত সুলতানগঞ্জের ছোট কুমারসাহেবের নেশার খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছে রাতের পর রাত। যে ঘৃণা করেছে সমস্ত পরিবেশকে, যে নিজের ভাইবোন মা বাবা সকলকে ঘৃণা করেছে, ঘৃণা করেছে

প্রতিবেশীদের, ঘৃণা করেছে নিজেকে পর্যন্ত, সে যদি আজ ঘৃণা করতে গিয়ে কয়েকজনের মহৎ উপকার করে থাকে তো সেটাই কি কম কথা !

রাত্রে নেশার ঘোরে যখন সুলতানগঞ্জের ছোটকুমার সাহেবের বাহুবেষ্টনে থেকে প্রশ্ন করেছে—আমায় তুমি বিয়ে করবে? আমাকে রাণী করবে?

ছোটকুমার সাহেব হয়ত আদর করে বলেছে—তুমি আমার এস্টেটের প্রিন্সেস্ নাই বা হলে, তুমি আমার হৃদয় রাজ্যের প্রিন্সেস, আমার হৃদয়ের রাণী।

সাহেব-বৌদি বলেছে—কিন্তু আমি তোমার হারেমের প্রিন্সেস হতে চাই—উড স্ট্রিটের নয়—

ছোটকুমার সাহেব বলেছে—কিন্তু সেখানে যে আরো চারজন আছে—

সাহেব-বৌদি বলেছে—তা হোক, আমি গিয়ে পাঁচজন হলে ক্ষতি কী?

ছোটকুমার সাহেব বলেছে—তা হয় না।

—কেন হয় না?

ছোটকুমার সাহেব বলেছে—তোমার যদি ছেলে হয় তো, সে যে সুলতানগঞ্জের এস্টেটের অংশীদার হতে চাইবে! তুমি আমার হৃদয়ের অংশীদার হতে চাইলে তা দিতে পারি, কিন্তু এস্টেট যে জয়েন্ট প্রপার্টি!

সাহেব-বৌদি বলেছে—আমার সুখের চেয়ে তোমার এস্টেটই বড়ো হলো? এই তোমার ভালোবাসা?

ছোটকুমার সাহেব বললে—আর একটু হুইস্কি খাও, তোমার নেশা হয়নি, নেশা হলে দেখবে ও সব কিছু মনে থাকবে না—

সাহেব-বৌদি বললে—নেশায় ভোলাতে পারবে আমাকে তেমন দেশের মেয়ে নই আমি, আমি নিজের দেশ ছেড়ে নেশা করতে

ইণ্ডিয়ায় আসিনি, আমাদের দেশে নেশা করবার অনেক জিনিস আছে।

ছোটকুমার সাহেব বলেছে—তবে কিসের জন্যে এসেছ?

সাহেব-বৌদি বলেছে—আমি প্রিন্সেস হতে এসেছি, রাণী হতে এসেছি—

ছোটকুমার সাহেব অবাক্ হয়ে গিয়েছে, বলেছে—রাণী হতে? তাহলে প্রিন্সকে বিয়ে করা উচিত ছিল তোমার!

সাহেব-বৌদি বলেছে—আমি প্রিন্সকেই বিয়ে করেছিলুম—

ছোটকুমার বলেছে—কোথাকার প্রিন্স? কোথায় তার এস্টেট?

সাহেব-বৌদি বলেছিল—সে প্রিন্সও নয়, এস্টেটও তার নেই! দুধের স্বাদ আমি ঘোলে মিটিয়েছিলুম—লোকের কাছে তাকে প্রিন্স বলেই পরিচয় দিয়েছিলুম, কিন্তু সে আমার কপালে টিকলো না, ভেজাল আমার সইল না, অথচ তখন হার মানতেও পারি না,—তাই প্রিন্সের খোঁজে বেরোলাম, হোটেলের বার-এ গিয়ে নাচতে লাগলাম—শেষকালে তুমি এলে সত্যিকারের প্রিন্স, সুলতানগঞ্জের প্রিন্স, ছোটকুমাব সাহেব!

ছোটকুমার সাহেব যেন বিরক্ত হয়ে উঠলো। হারেমে তার অনেক নারী আছে, বাইরে তার অনেক নারীর সংস্রবে আসতে হয়েছে। এমন আবদার কেউ ধরেনি! অনেক দামী নেশা কেটে যাবার অবস্থা হল সাহেব-বৌদির কথা শুনে।

সাহেব-বৌদি বললে—শেষ পর্যন্ত জীবনে সেই প্রিন্সই এল ঠিক—কিন্তু আমি সত্যিকারের প্রিন্সেস হতে পারলাম না!

সাহেব-বৌদি আবার সিগারেট টানতে লাগলো। বললে—শেষে এক পার্টিতে গিয়ে আলাপ হল ফতেগড়ের বড়ে মহারাজার সঙ্গে, মহারাজার রাণী সবে মারা গেছে, চুল পেকেছে কিন্তু নেশা কাটেনি। অনেক টাকা, অনেক বড় জমিদারী, হাতী, ঘোড়া, উট, পাইক-পেয়াদা, লোক-লস্কর, তাঞ্জাম এই যা কিছু দেখছিস্ সব তার—কলকাতায়

এসেছিল পয়সা ওড়াতে—সেখানে আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

মহারাজ বললে—আমি তোমায় রাণী করবো ইংলিশওয়ালী!

সাহেব-বৌদি বললে—কত করে দেবে আমাকে? সুলতানগঞ্জের ছোটকুমার সাহেব দেয় দশহাজার টাকা—অল ফাউণ্ড—

বড়ে মহারাজা বললে—আমার সর্বস্বই তুমি পাবে, সবই তোমার, আমিও তোমার—

ভোর রাত্রে পালাবার ব্যবস্থা হলো। ভোর রাত্রে একখানা গাড়ি এসে উড স্ট্রিটের বাড়ির সামনে দাঁড়াবে। দারোয়ান, খানসামা, চাপরাশি সকলকে ঘুষ দেওয়া হলো মোটা। সবাই বলবে—কিছু জানে না। সবাই ঘুমিয়ে থাকবার ভান করবে। একদিন ইংলণ্ডের গ্রামের এক পাথরের সাঁকোর তলায় যখন জন্ম হয়েছিল সাহেব-বৌদির, সে-ঘটনাও কেউ দেখেনি একটা সামান্য সরিসৃপ ছাড়া, আর সেদিন গীর্জার ঘড়িতে ঘণ্টার ধ্বনিতে যিশু খৃষ্টের কোন্ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল তা কেউ মনেও রাখেনি। তারপর জীবনের গতি কত বিচিত্র পথ অতিক্রম করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কোন্ দেশে এসে কোথায় পরিণতি লাভ করবে তাও কেউ বলতে পারেনি। যিশু-খৃষ্টের দেশ থেকে গৌতম বুদ্ধের দেশে এসেও তার কোনও ব্যতিক্রম, কোনও পরিবর্তন হলো না। সাহেব-বৌদির জীবনে খৃষ্ট বুদ্ধ মহম্মদ সব একাকার হয়ে গেল। ঘৃণা আর সন্দেহ, পাপ আর কদর্যতার পরিবেশ থেকে মুক্তির আপ্রাণ চেষ্টায় কোথায় কত দূরে কত গভীরে তলিয়ে যাচ্ছিল তা-ও কেউ জানতো। আমি যে-টুকু জেনেছিলাম শুধু সে টুকুরই সাক্ষী ছিলাম! সে অতি সামান্য!

চায়ের দোকানের এক কোণে সাহেব-বৌদির ভাই সেদিন আমার কথা শুনে অবাকই হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—কিন্তু দিদির কি প্রিন্সের সঙ্গে তা হলে বিয়ে হয়নি?

বলেছিলাম—না।

জিজ্ঞেস করেছিল—তা হলে মাসে হাজার হাজার পাউণ্ড কী করে পাঠায়?

বললাম—নিজে খায়নি, নিজের চিকিৎসা করেনি, নিজের সব রক্ত জল করে উপায় করা পয়সা তোমাদের পাঠিয়েছে।

আরো অবাক্ হয়ে গেল সে।

বললে—কিন্তু আমাদের তো আর টাকা পাঠাবার দরকার নেই, সব ভাইরা চাকরি পেয়ে গেছি, বোনদের বিয়ে হচ্ছে, আমরা বাড়ি কিনেছি লিস্টার স্কোয়ারে, মা মারা গেছে, বাবাও মারা গেছে জেলে—আমি একবার চিঠিতে লিখেছিলাম, সে চিঠি কি পায়নি তবে?

ছেলেটার লাল চেহারা। আমার সামনে বসে গরমের দেশে ঘামতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলে—কোথা থেকে এত টাকা পেত বাবু বলতে পারো?

বললাম—না!

মিথ্যে কথাই বললাম।

তারপর জিজ্ঞেস করলে—এখন কোথায় আছে, জানো?

নিজেকে আরো শক্ত করে নিলাম। আরো দৃঢ় করে নিলাম নিজেকে।

বললাম—মারা গেছে—

পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে এল চেহারা। বললে—মারা গেছে? কবে?

বললাম—কাল।

কালকের দৃশ্যটা আমার আবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়িটার উঠোনে পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে আছি। দেখলাম সুলতানগঞ্জের ছোটকুমার সাহেবের নতুন গাড়ি থেকে নামলো সাহেব-বৌদি। চেয়ে দেখলাম—শরীরের সমস্ত রক্ত যেন কে শুষে নিয়েছে তার। লম্বা আঁট ট্রাউজার আর ঢিলে সিল্কের

সার্ট, কলার তোলা ঘাড়ের ওপর। সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে উঠতে লাগলো সাহেব-বৌদি। কিন্তু পেটে যেন তবু অনেক দিনের ক্ষিদে, চোখে যেন অনেক রাতের জাগা, পায়ে যেন অনেক চলার ক্লান্তি! হয়ত এখুনি গিয়ে সমস্ত পোশাক ছেড়ে ময়লা গাউন পরবে। দোকানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে জামা-কাপড়-জুতো-গয়না সব। আর সাড়ে পাঁচ টাকা ভাড়া, তা-ও বাকিতে থাকবে সেদিনকার মত। আর ডাক্তার বসাক বলবে—এ রকম করে আর বেশিদিন কিন্তু চলবে না মিস্ স্মিথ!

তা এ-ও একরকম মৃত্যু ছাড়া আর কী! মৃত্যু যদি না-ই বলি, অপমৃত্যু তো।

সাহেব-বৌদির ভাই-এর হঠাৎ কী হলো কে জানে! আমার কথা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। চোখে উদাস দৃষ্টি। চোখে বোধহয় জল আসবে! হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর দুই হাতে ক্রস্ চিহ্ন করে খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট বাইবেল বার করে মাঝখান থেকেই পড়তে লাগলো—

But love ye your enemies, and do good, and lend hoping for nothing again : and your reward shall be great and ye shall be the children of the Highest... Who can forgive sins but God only...

এই বাইবেল উপলক্ষ করেই আজ সাহেব-বৌদিকে মনে পড়লো। আবু-পাহাড়েও আজ কয়েক বছর হলো গিয়েছি। তারপরে কত বছর কেটে গেছে। কত বছর ধরে কত কী লিখেছি। এটা-সেটা! ছোটবেলাকার স্মৃতি থেকে অনেক কিছু আহরণ করে নতুন চোখ দিয়ে দেখেছি সে-সব। নতুন চোখ নিয়েই যা-কিছু লিখেছি। সাহেব-বৌদিকে এদের তালিকা থেকে বাদই দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সাহেব-বৌদি আমাদের দেশের বাঙালী মেয়েও তো নয়,

ইংরেজের দেশের গরীব একটি মেয়ের কথা কে আর শুনবে। তার সঙ্গে আমার যে-সম্পর্কই থাক, পাঠক-পাঠিকাদের তাতে কী এসে যাবে! আমি যেমন ভাবে সাহেব-বৌদির জন্য পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম তেমন ভাবে কে অনুভব করবে! আমার মা, রাঙা-কাকীমা, বড় জ্যাঠাইমা, বাবা কাকা জ্যাঠামশাই কেউ-ই সেই বিদেশিনী মেয়েকে আপন করে নিতে পারেনি! সাহেব-বৌদির সঙ্গে আমার যে সামান্য দরদ আছে লুকোনো, তা একান্ত আমারই আপন সম্পদ হয়ে থাক। কিন্তু আমার মত বদলাতে হলো ওই বাইবেল উপলক্ষ করেই!

কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময় বাইবেল পড়তে হয়েছিল আমাদের। আশুতোষ কলেজের এক প্রফেসর বাইবেল পড়াতেন। তেমন করে পড়ালে হয়ত মনে থাকতো কিছু! কিন্তু কিছুই মনে নেই আজ! তারপর একদিন···

একদিন ট্রেনে চড়ে আসছিলাম! আসছিলাম কাট্‌নি থেকে

ট্রেন ছেড়েছে সকাল ন'টায়। গরমের দিন। সি-পি'র গরম। ঘাম হয় না, পুড়িয়ে দেয়। পকেটে রসুন, টুপিতে নিমপাতা রেখে গরম কাটাই। দরজা-জানলা বন্ধ করেও স্বস্তি নেই। দেয়ালে হেলান দিয়ে সুখ নেই। শুয়ে, ঘুমিয়ে, দাঁড়িয়ে, জেগে কিছুতেই শান্তি নেই। এক-একটা করে স্টেশন আসে আর মনে হয় পথ যেন আরো লম্বা হতে চলেছে। একে একে উমেরিয়া স্টেশনও পেরিয়ে গেলাম, তারপর বড় স্টেশন এল অনুপপুর। অনুপপুর জংশন। ওদিক থেকে চিরিমিরি মনেন্দ্রগড় থেকে লাইন এসে মিশেছে এখানে। যারা বিলাসপুরের যাত্রী তারা এইখানে গাড়ি বদলাবে।

আমার কামরায় আমি একাই ছিলাম এতক্ষণ।

এবার এসে উঠলেন এক পাদরি সাহেব। বৃদ্ধ মানুষ, সারা মাথায় টাক। কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। গরম দামি সুট। বেঁটে

খাটো মানুষটি। হাসিতে সর্বক্ষণ উপচে পড়ছেন। গরমে যখন আমি আই-ঢাই করছি, তিনি বেশ গরম-জামা গায়ে দিয়ে আরামে আছেন মনে হলো।

হাসতে হাসতে নিজেই বললেন—আমি পেণ্ড্রারোড যাবো—আপনি ?

আমি যাবো বিলাসপুর। সুতরাং তিনিই আগে নেমে যাবেন।

কিন্তু অদ্ভুত তাঁর কর্মক্ষমতা। বসেই টাইপরাইটার নিয়ে কী যেন টাইপ করতে লেগে গেলেন। তারপব একটা স্টেশন আসতেই ক্যামেরাটা নিয়ে বাইরের জনতার দৃশ্যের ছবি তুলে নিলেন। তারপর ক্যামেরা রেখে বই নিয়ে বসলেন। খানিক গল্পও কবলেন আমাব সঙ্গে। আমি গল্প লিখি শুনে বললেন—All Bengalees are poets—সব বাঙালীই তো কবি! বলেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন। কিন্তু সে-হাসিতে কোনও শ্লেষ বা জ্বালা নেই। বললেন—আঠারো বছর তিনি আছেন পেণ্ড্রারোডের জঙ্গলে। ছত্রিশগড়িয়াদের মধ্যে তাঁর জীবন কাটছে। নিজের দেশ, নিজের দেশের মানুষদের ভুলে কেমন করে আছেন ভেবে সত্যিই অবাক্ লেগেছিল। জঙ্গল ? তা জঙ্গলে কি মানুষ নেই। সেখানেই ঘর বানিয়ে ফেলেছেন নিজের। স্কুল করেছেন, তাদের জন্যে চার্চ আছে, হসপিটেল আছে, লাইব্রেরী আছে—আর আছে গেম্‌স্। খেলাধুলো নিয়ে কেটে যায় জীবন! স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এমনি করে জীবনের আঠারোটা বছর কাটিয়ে দিলেন। আরো কত বছর কাটিয়ে দেবেন তার হিসেব কি।

এক সময়ে পেণ্ড্রারোড স্টেশন এসে গেল!

এবার তাঁর নেমে যাবার পালা। হাসতে হাসতে আমার কাছে বিদায় নিয়ে নামতে গেলেন। কিন্তু নামবার আগে একটা কাণ্ড করে গেলেন। আর এ-ঘটনাটি না-ঘটলে হয়ত এ কাহিনীর জন্মই হতো না।

তিনি বললেন—নমস্কার, আসি তা হলে—যদি কখনও পেণ্ড্রা-

রোডে আসেন আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবেন—আপনার চায়ের নেমন্তন্ন রইল—

বলেই ব্যাগ থেকে একটা ছোট চামড়ায় বাঁধানো বই বার করে বললেন—এই পবিত্র বাইবেলটি আপনাকে উপহার দিয়ে গেলাম, যদি কখনও সময় পান তো এটি পড়ে দেখবেন—

দেখলাম—চমৎকার সোনার জলে ছাপা বই।

বললাম—ধন্যবাদ—

স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে বললেন—পড়বার সময়ে একটা কথা মনে রাখবেন, ক্যালিফোর্ণিয়ার ছাত্ররা ছ'মাস আলু না খেয়ে সেই পয়সা বাঁচিয়ে এই বই ছাপিয়েছে—তাঁদের ধর্ম-পিপাসার টোকেন্ হিসেবে এটি কাছে রাখলে আমিও অত্যন্ত বাধিত হবো,··· আচ্ছা আসি, নমস্কার—

ট্রেন ছেড়ে দিল।

মনে মনে হাসলাম খানিকক্ষণ। ধর্মপ্রচারের এ-ও একরকম পন্থা। অভিনব পন্থাও বলা চলে। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে বাইবেলটার পাতা ওল্টাতে গিয়ে যেখানটায় প্রথম চোখ পড়লো, সেখানটা পড়তে গিয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। ঠিক এই লাইনটাতেই কি চোখ পড়তে হয়! দেখি লেখা রয়েছে—But love ye your enemies and do good, and lend hoping for nothing again ; and your reward shall be great and ye shall be the children of the Highest....Who can forgive sins but God only...

সামান্য একটি বিনা-পয়সায় পাওয়া বাইবেল, আর সামান্য ক'টি লাইন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সব মনে পড়ে গেল—সব!

আর মনে পড়ে গেল রোহিনীবাবুর কথা। আমাদের ইস্কুলের ভূগোলের মাষ্টার মশাই রোহিনীবাবু একদিন ক্লাশে দাঁড়িয়ে

জিজ্ঞেস করেছিলেন—বলো তো মহাভারতের সব চেয়ে বড় চরিত্র কে ?

পঞ্চা বলেছিল—অর্জুন স্যার—

সুবোধ বলেছিল—ভীম স্যার—

ফটিক বলেছিল—কর্ণ স্যার—

সারা ক্লাশময় সমস্ত ছেলের সার ঘুরে ঘুরে আমার কাছে এসে পড়েছিল প্রশ্নটা।

আমি টপ্ করে বলে উঠলুম—যুধিষ্ঠির স্যার—

ঠিক হয়েছে ! বেশ, তোমার উত্তরে আমি খুব খুশী হয়েছি।

সেদিন ক্লাসের সমস্ত ছেলের মধ্যে গর্বে আমার মাথা উঁচু হয়ে উঠেছিল। আমার উত্তরই ঠিক, আর সকলের ভুল। কিন্তু আজ এতদিন পরে ভাবতেও আমাব মাথা হেঁট হয়ে যায়। সেদিনকার সেই ঠিক কবে আমারই অজ্ঞাতে একদিন বেঠিক হয়ে যাবে তাই-ই কি আমি জানতাম ! সেদিন বড় গর্ব নিয়ে যে-মাথা উঁচু করে বাড়ি এসেছিলাম, সেই মাথাই যে আবার আজ নিজের অজ্ঞতায় নিচু করতে হবে তাই-ই কি আমার জানা ছিল ! সংসারে বাইরের সাফল্যই কি বড় ? উত্তরণের অক্লান্ত নিষ্ঠা যদি শেষপর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত না-ই হয় তবে কি সব ব্যর্থ ! যদি বলি সাহেব-বৌদিও সার্থক—সাহেব-বৌদির নিষ্ঠাও সফলতার সমান, তবে কি আমি ভুল করবো।

সুলতানগঞ্জের কুমার সাহেবের উড স্ট্রিটের প্রাসাদ থেকে যেদিন সাহেব-বৌদি পালিয়েছিল সে-ও এক উত্তরণ বৈকি ! উত্তরণের প্রচেষ্টাও একরকম উত্তরণ। অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ ! সাধারণ থেকে অসাধারণে উত্তরণ, মৃত্যু থেকে জীবনে। জীবন থেকে জীবনাতীতে !

দশ হাজার থেকে কুড়ি হাজারে। ফতেগড়ের বড়ে মহারাজা রাঠোর বংশের কুলতিলক। তাঁর টাকার অভাব নেই। বড়ে

রাণীর পদটাও খালি পড়ে আছে। কুড়িহাজার কেন, সমস্ত রাজ্যটা দিয়ে দিতেও তাঁর আপত্তি নেই। যখন হোটেলের খানা-ঘরে আলাপ হলো নিজের ঐশ্বর্যের আর বংশ-গৌরবের ফিরিস্তিটাও দিয়ে দিলেন। নিজের গুণপনাও সবিস্তারে বললেন।

বললেন—সাতবার মন্টি কার্লো গেছি, তেরোবার ডার্বি জিতেছে আমার ঘোড়া—সতেরো বোতল হুইস্কি এক টেবিলে বসে খেতে পারি—

তারপর বলেছেন—হায়দরাবাদের নিজামের পর—এত রেভিনিউ আর কোনও নেটিভ্ প্রিন্স দিল্লীর দরবারে পাঠায় না—তা জানো—

ওখানকার লোকেরা বলে—বড়ে মহারাজা দৌলতদার মানুষ। দৌলত অনেকেরই থাকে, কিন্তু দৌলতদার হওয়া সহজ কথা নয়। নতুন মডেলের গাড়ি বাজারে উঠলে পুরনোতে আর মন ওঠে না তাঁর। এমনি করে শুধু নজরের খাতিরে স্টেটের অনেক গাড়ি, অনেক প্রাসাদ, হাওয়া মহল, আয়না মহল হয়েছে! কিন্তু নেই শুধু রাণী। চৌহান বংশের এক মেয়ে একদিন প্রথম বধূ হয়ে এসেছিল ফতেগড়ে! শুধু চৌহান নয়, তিনটে খানদানী রাজ-বংশ থেকে মেয়ে এসেছিল দৌলতদারের অঙ্কশায়িনী হতে। কিন্তু টেকেনি কেউ। ছেলে হতে গিয়ে মরে গেছে সবাই। তারপর আর সাদি হয়নি মহারাজার। তারপর যারা এসেছে তারা এদেশের কেউ নয়। কেউ জার্ম্মান, কেউ ইটালিয়ান, কেউ বা জু! কিন্তু তারাও কেউ টিকতে পারেনি। তারা রাজ-বধূ হয়নি বটে, আলাদা প্রাসাদে তারা ছিল, আলাদা তাদের লোক লস্কর, খানসামা, বাবুর্চি বয় বেয়ারা। মহারাজা যেখানে যখন খুশী হয়েছে, গেছেন, রাত কাটিয়ে এসেছেন। কিন্তু তবু মন পাননি তাদের। তারা কেউ সন্তুষ্ট হয়নি। একে একে সবাই চলে গেছে—আর যাবার সময় মোটা টাকার খেসারত জহরত নিয়ে গেছে।

এবার পালা পড়েছে সাহেব-বৌদির।

মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন—কতদিন তুমি ইণ্ডিয়ায় এসেছ ?

তখন সাহেব-বৌদি সুলতানগঞ্জের কুমার-সাহেবের টাকায় এদেশের অনেক হালচাল শিখে ফেলেছে। বললে—তিনমাস মাত্র—

মাত্র তিনমাস! টাটকা তাজা জিনিস। বিলেত থেকে নতুন আমদানীই বলা যায়। বড়ে মহারাজা প্রীত হলেন কথাটা শুনে। তাঁর পছন্দের সঙ্গে তাঁর নজরের সঙ্গে মিলে গেছে।

বললেন—তোমাকে রাণী করবো আমি—আমার স্টেটের রাণী-সাহেবা—তোমার নিজের নামেও একটা এস্টেট্ লিখে দেব—তার সমস্ত উপসত্ব তোমার—

সাহেব-বৌদি বললে—কিন্তু আমাকে খোদ্ রাণী বানাতে হবে—মনে থাকে যেন—

বড়ে মহারাজ বললেন—খোদ রাণীই বানাবো—একেবারে পুরুত দিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে জাতে তুলে নেব—আর কী চাই ?

সাহেব বৌদি বললে—আর একটা কথা—

বড়ে মহারাজ বললেন—কী ?

—যত টাকা খুশী, আমি দেশে পাঠাবো, কেউ কিছু বলতে পারবে না।

কোথায় পাঠাবে ?

তা হোক, বড়ে মহারাজার তাতে আপত্তি নেই। দৌলতদার মানুষ, দৌলতেরও কম্‌তি নেই তাঁর। পাকা-পোক্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তারপর উড ষ্ট্রীটের ফ্লাট থেকে একদিন উধাও হয়ে গেল সাহেব-বৌদি! সুলতানগঞ্জের ছোটকুমার সাহেবের এই নিয়ে এমন ঘটনা বার তিনেক ঘটলো। সুতরাং এ-নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাবার রইল না।

তারপরেই এই আবু পাহাড়।

সেদিন যথাসময়ে সাহেব-বৌদির গাড়ি আমাকে মহারাজার হাওয়া-মহলে নামিয়ে দিয়েছে।

সেই পাগড়ি বাঁধা রাজপুতটা সেই দিনই দুপুরবেলা আমার হাওয়া-মহলের দরজায় এসে সেলাম করে দাঁড়ালো। বললে—হুঁজুরাইন সাহেবকে এত্তেলা দিয়েছে—

আবু পাহাড়ে আসার পর মুহূর্ত থেকেই হুঁজুরাইনের অতিথি সংকারের নানা পরিচয় পেয়েছি। চারিদিকে ঠাণ্ডা আবহাওয়া। নাক্‌কি লেক্ ছাড়িয়ে টোড রক্ ছাড়িয়ে সান্-সেট পয়েণ্টের দিকে যাবার পথের এধারে আমার থাকবার বাড়ি হাওয়া-মহল। আব রাস্তার ওধারে আর একটু দূরে হুঁজুরাইনের প্রাসাদ, ফতেগড় স্টেটের বড়ে মহারাজার প্রাসাদ। মহারাজার বয়েস হয়েছে। তা হোক। হুঁজুরাইনেরও বয়েস কম নয়। লোক-লস্কর পাইক-পেয়াদা বরকন্দাজ চাপরাশি খানসামা বেয়ারা বাবুর্চি আয়া তাঞ্জাম গাড়ি ঘোড়া উট সব এসেছে। ও সব না এলে রাণী-সাহেবার ইজ্জত থাকে না। ফতেগড়ের বড়ে মহারাজার সম্মানে আঘাত লাগে।

আসার পর থেকেই ভারে ভারে খাবার এনেছে। জিলেবী লাড়ু পেড়া পুরী মেঠাই। এসেছে মাংস মাছ পোলাও কারি। গরম জল দিয়েছে স্নান করবার, হাত মুখ ধোবার। আপ্যায়নের কিছু ত্রুটি নেই কোনখানে। সঙ্গে চিঠি এসেছে।

বললাম—হুঁজুরাইন কী করছেন এখন?

লোকটা বললে—হুঁজুরাইনের গোশল হয়ে গেছে, এখন গা ডলাই-মলাই হচ্ছে, তারপর পোশাক পরানো হবে—

বললাম—বড়ে মহারাজা আসবে না?

লোকটা কিছু বলতে পারলে না। বাড়ির বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গাড়ি করেই সাহেব-বৌদির বাড়িতে গিয়ে পৌছুলাম। সামনেই বন্দুক ভর্তি বেল্ট পরা দারোয়ান এসে সেলাম করে গাড়ির দরজা খুলে দিলে। ঘড়-ঘড় শব্দ করে ইস্পাতের গেট খুলে গেল। আগাগোড়া কার্পেট পাতা।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। চারিদিকে বাঘ আর

হাতীর বাঁধানো কঙ্কাল। বড়ে মহারাজার নাকি ভারি শিকারের শখ। শখের শেষ নেই বড়ে মহারাজার। শুধু শিকারের শখই নয়, মদের শখও আছে। রাজপুতানার মরুভূমিতে ও না হলে শরীর শুকিয়ে যায় তাঁর। ফুলেরও শখ আছে। পাখীরও শখ আছে। জীবন্ত জানোয়ার পাখী পায়রা পোষার শখ আছে। মেয়েমানুষের শখ আছে কিনা প্রমাণ পেলুম না।

এ-মহল পেরিয়ে ও-মহলে গেলাম। ঘরের পর ঘর, অলিন্দের পর অলিন্দ, ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরের মিছিল চলেছে। চারিদিকে বড় বড় আয়না। যেন শিষ-মহল। ঘরের মধ্যে দাঁড়ালে হাজার দিক থেকে চেহারা দেখা যাবে। হাজার কোণ থেকে। সর্বাঙ্গের আবরণ খুলে ফেলে এখানে নাচ দেখেন বড়ে মহারাজ।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম চারিদিকে চেয়ে চেয়ে। এখানে এলে সাহেব-বৌদির ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের সেই ভাঙা ফ্ল্যাটটার কথা মনে পড়া যেন অপরাধ।

শুধু শ্বেত ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের একটা ঘর। ছাদ থেকে শুরু করে দেয়াল, এমন কি টেবিল চেয়ার বেঞ্চি সোফা সব ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের। আলোটাও পাথরের শেড-এ ঢাকা।

তারপরের ঘরে শুধু কালো মেহগনি কাঠের সাজ। আগাগোড়া কাঠ। ছাদের মাথা থেকে শুরু করে আলো, দেয়াল, ফার্নিচার, মেঝে, টেবিল চেয়ার সব যেন একখানা কাঠের তৈরি। কোথাও জোড় নেই। চক চক করছে পালিশ। মুখ দেখা যায় এমন পরিষ্কার।

কোথা থেকে যেন গানের ক্ষীণ শব্দ আসছে। যেন কোন স্বপ্ন-রাজ্যে চলে এসেছি। হুঁজুরাইন নিজে পছন্দ করে, নিজের তদারকে এ-বাড়ি করিয়েছেন। এ যা-কিছু সব হুঁজুরাইনের। হুঁজুরাইনের জন্যে বড়ে মহারাজা ফতেগড়ে আরো বড় প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছেন। চারদিকে তার এক-মাইল লম্বা লেক। পাশেই পাহাড়। পাহাড়ের

ওপর গাছে গাছে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়। সেইখানে হুঁজুরাইনের জন্যে গীর্জা থেকে হিম্‌ন্‌-এর সঙ্গে ঘণ্টা বাজে। সে ঘণ্টার ধ্বনি লেক-এর জলের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে এসে হুঁজুরাইনের প্রাসাদ চূড়ায় মিলিয়ে যায়।

মনে হয় ঘণ্টার শব্দ যেন একসময় বাঙ্ময় হয়ে বলে—

And I; John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

And I heard a great voice out of heaven saying-Behold, the tabernacle of God is with men and he will dwell with them, and they shall be his people and God himself shall be with them and be their God.

And God shall wipe away all tears from their eyes ; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain...Who can forgive sins but God only.

মনে আছে একটা ঘরে আমাকে বসিয়ে লোকটা চলে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে সাহেব-বৌদি এল। কিন্তু এ চেহারা দেখে আমি যেন আর চিনতে পারলাম না। কালকে আপারোড স্টেশনেও দেখেছি ঘোমটা দেওয়া সলমা চুমকির ওড়না ঢাকা মূর্তি। কিন্তু এ যেন আরো সুন্দর। সাহেব বৌদির বয়েস যেন আরো কমে গেছে, আরো খাঁজ পড়েছে শরীরে, আরো টোল পড়েছে গালে, আরো নেশা জমেছে চোখে, আরো রঙিন হয়েছে, আরো নরম হয়েছে! পায়ে একটা সোনালি জরির চটি। গায়ে রূপার জালি ওড়না, কানে হীরের ঝুমকো, গলায় মুক্তোর হার। সিঁথিতে টিকলি।

মনে আছে এক ফাঁকে সাহেব-বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখন তো সত্যিকারের রাণী হতে পেরেছ সাহেব-বৌদি?

মনে হয়েছিল যে-ঘৃণা আর যে-কদর্য আবহাওয়া থেকে মুক্তি চেয়েছিল সাহেব-বৌদি সারা জীবন ধরে, আজ যেন তা সার্থক হয়েছে। অনেক বছর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ সুখী হতে পেরেছে। আজ নিজেকে ভালো বাসতে শিখেছে। আজ রাণী হয়েছে, প্রিন্সেস হয়েছে, রাণীসাহেবা হতে পেরেছে।

সাহেব-বৌদির আয়া একটা ট্রে-তে করে গ্লাস বোতল পেগ আর সিগারেটের টিন দেশলাই দিয়ে গেল।

সাহেব-বৌদি হাতের ইঙ্গিতে তাকে যেতে বললে। সোনার পাইপে সিগারেট লাগিয়ে সাহেব-বৌদি একটা সিগারেট ধরালো।

আবার বললাম—এবার তুমি সুখী তো সাহেব-বৌদি?

সাহেব-বৌদি আমার কথায় কান দিলে না। আপন মনে একবার গ্লাসে চুমুক দিলে। মনে হলো যেন এতদিনে প্রশান্তির সমুদ্রে অবগাহন করে চরিতার্থ হয়েছে সাহেব-বৌদি। চরিতার্থতার চিহ্ন সর্বাঙ্গে। আরো সুন্দর, আরো উজ্জ্বল। ভোর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত আর পুরুষের প্রলোভনে নিজেকে পদদলিত করাতে হয়না। এখন নির্বিরোধ শান্তি। ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে হাতের কাছে দশটা আয়া এসে আদেশের অপেক্ষায় হাজির থাকে। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে তার মর্জির অপেক্ষা করে। রাণীসাহেবার গাড়ি যাবার পথে পথচারীরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অভিবাদন করে। দীর্ঘজীবন কামনা করে তার। বড়ে মহারাজা ফ্রান্স থেকে আনিয়ে দেন ফার্নিচার রাণীসাহেবার মনস্তুষ্টির আশায়। সুইজারল্যাণ্ড থেকে ঘড়ি আনিয়ে দেন হাতের কব্জির শোভার জন্যে। গাউন তৈরি হয়ে আসে ইংলণ্ডের বণ্ড স্ট্রিট থেকে। বিলাস ঐশ্বর্যের আর বাকি কী! রাণীসাহেবার হাতী তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেলাম করতে শিখেছে। রাণীসাহেবার নিজের ঘোড়া কলকাতার ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতেছে। সংসারী মানুষ আর কী চায়!

অনেক কথা জিজ্ঞেস করলে সাহেব-বৌদি। বিয়ে হয়েছে কিনা।

কলকাতার কী অবস্থা। কোথায় চাকরি করছি। মা, বাবা, জ্যাঠামশাই সকলের খবর নিলে।

জিজ্ঞেস করলাম—এই রকম পোশাক পরতে তোমার অসুবিধে হয় না ?

খানিকপরে আবার জিজ্ঞেস করলাম—এতদিনে সত্যিই তা হলে রাণীসাহেবা হলে ?

রাণীসাহেবার চোখ দিয়ে সত্যিই জল পড়তে লাগলো !

তখনও কি জানি, সত্যিই রাণীসাহেবা হওয়া হয়নি সাহেব-বৌদির। ফতেগড়ের নতুন প্রাসাদে থেকে দূরে চেয়ে দেখা যায় লেকের ধারের গীর্জাটা ! এ-প্রাসাদে আরো অনেক নারী এসে আশ্রয় নিয়েছে। বড়ে মহারাজার সৌখ্ মিটিয়েছে নানা জাতের পুতুল। যেদিকে চোখ যায় সবই রাণী-সাহেবার এস্টেট্। এস্টেটের দলিল দস্তাবেজ তৈরি হয়ে গেছে। রাজ্যের প্রজারা জানে এবার যিনি এসেছেন ইনি তাদের ভাবী রাণী, ভাবী রাণীসাহেবা। দুয়োরাণী নয়, একেবারে সুয়োরাণী। তাদের হুকুমজারী করবার মালিকানী ! তাদের হুঁজুরাইন !

বড়ে মহারাজ নতুন গাড়িটা চালিয়ে সোজা একেবারে ভেতরের ব্যালকনির নিচে এসে নামেন। আজই সব পাকা হওয়ার কথা।

সাহেব-বৌদি জিজ্ঞেস করে—তারিখ পাকা হলো মহারাজ সাহেব ?

বড়ে মহারাজ বলেন—একটু বখেড়া বেঁধেছে আবার—

—কীসের বখেড়া ?

—এস্টেটের পুরুত ঠাকুরের বড়ে লেড়কা হঠাৎ মারা গেছে, এখন অশৌচ, একটু সবুর করতে হবে !

এ তো গেল একটা। এমনি করে আরো অনেক বখেড়া এল গেল। কিছুতেই আর সুরাহা হয় না।

মহারাজ বলেন—ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? নতুন হুইস্কির চালান এসেছে, খুলি—

কেবল হুইস্কিই নয়, নতুন গয়না, নতুন গাড়ি, নতুন গাউন। এই নিয়েই দেরি হয়ে যায়। আসল কাজের কথাটা ওঠে না। গাড়ি নিয়ে দু'জনে বেড়াতে বেরোন। লেক-এর পার দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে স্টেটের সীমানার গায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে হঠাৎ কানে আসে গীর্জার ঘণ্টার শব্দ! বহুদূর থেকে ভেসে আসে শব্দ! অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ে। গীর্জায় গিয়ে দেখি মাদার মেরির মূর্তির সামনে আগেও কতদিন কৌতূহলী চোখ নিয়ে দেখেছে। সেদিন কোনও কিছু ভাবান্তর হয়নি মনে। গীর্জার মূর্তিকে তার মূর্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। কিন্তু এখন এমন হয় কেন! বড়ে মহারাজার টাকাগুলোও কেন আঘাত করে তাকে আজকাল!

দেশ থেকে চিঠি আসে। ম্যাটিল্ডার বিয়ে হয়েছে। সুখে আছে তারা। লিষ্টার স্কোয়ারের নতুন বাড়িতে ভাইরা সবাই উঠে গিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছে। ম্যাগি কর্ণেলকে বিয়ে করে সুখে আছে। কেটিরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে ডাক্তারের সঙ্গে—। তারা আছে নিউজার্সিতে। মিমি ভায়োলিন বাজিয়ে সার্টিফিকেট পেয়েছিল —এখন এনগেজ্‌ড্‌ হয়েছে এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। তারও বিয়ে হবে এই জুন-এ। দিদির কাছে দামী উপহারের আশা করছে সে। উইলী ডাক্তার হয়েছে—আর্মিতে ঢুকে ইণ্ডিয়ায় আসবে লিখেছে। আর হেনরি? হেনরি ছোট বেলা থেকেই খুব দুষ্টু ছিল—সেও শেষ পর্যন্ত নেভিতে ফার্স্ট-লেফ্‌টেনাণ্ট হয়েছে! আর কী? আর কী চেয়েছিল সাহেব-বৌদি! যা চেয়েছিল সবই পেয়েছে। সবাই সুখী হয়েছে। কিন্তু সাহেব-বৌদি নিজে?

নিজের কথা ভাবতে সুরু করতে গিয়েই হঠাৎ বাধা পড়লো।

ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টার ধ্বনি শুরু হলো। সে সঙ্গীত কানে এসে যেন সব বেসামাল গোলমাল করে দেয়। এলোমেলো হয়ে যায় সব। এই এস্টেট্‌, এই বড়ে মহারাজ, এই হাতী, উঠ, রেসের ঘোড়ী, যা কিছু তার সম্পত্তি, সব তুচ্ছ হয়ে যায়।

সাহেব-বৌদি বললে—তোমার কথা তুমি রাখলে না রাজাসাহেব !

—কী কথা ?

স্মরণ করতে গিয়ে বড়ে মহারাজ বিভ্রান্ত হয়ে যান। কোন্ কথা তিনি রাখেন নি ! রেসের ঘোড়ী চেয়েছিল ইংলিশওয়ালী, দিয়েছেন তিনি। নিজস্ব এস্টেট চেয়েছিল—দিয়েছেন। গাড়ি চেয়েছিল—দিয়েছেন। আর টাকা দিয়ে যা-কিছু কেনা যায়—সব চাও না, দেব। বেড়াতে যেতে চাও—চলো। প্যারিস চলো, লণ্ডন চলো, নিউ ইয়র্ক চলো, মন্টি কার্লো চলো। চলো না !

কিন্তু রাণীসাহেবার গদী ?

তাও হবে। দু'দিন সবুর করো। রাণীসাহেবা হওয়ার একটা পদ্ধতি আছে। তারও একটা রীতি আছে। রাণীসাহেবা ওম্‌নি হলেই হলো না। চারদিকে কুটুম-কুটুম্বিনীদের নেমন্তন্ন করতে হবে। নাচ হবে, গান হবে। হোম হবে। দান ধ্যান হবে। ভিখিরী-ভিখিরিনীদের ভোজন হবে। অন্দর-মহলে বার-মহলে উৎসব হবে। আর তা-ও কি একদিন ! গোটা একমাস ধরে। রেসিডেণ্ট সাহেব আসবে। লালজী সাহেব, লালজীবাঈ সাহেব, পর্দায়েত্‌জী, পাশোয়ানজী, কেউ বাদ পড়বে না। এ তো সোজা ব্যাপার নয় !

আস্তে আস্তে তার তোড়জোড়ও চলতে লাগলো।

ইংলিশওয়ালীর জন্যে টাকার ফোয়ারা ছুটতে লাগলো। ঢালোয়া হুকুম দিয়ে দিলেন বড়ে মহারাজ সাহেব। ইংলিশওয়ালীর স্লিপ্ পেলে যা-চায় দিতে হবে। এদেশে না-পাওয়া যায় তো বোম্বাইতে অর্ডার দাও। বোম্বাইতে না পাওয়া যায় তো কলকাতায় অর্ডার ভেজো। আর ইণ্ডিয়াতে না পাও—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীতে পাবে। তামাম দুনিয়া ঢুঁড়বে !

কিন্তু হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল।

ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ানের মন্ত্রী সর্দারজীর একটা সীল করা চিঠি একদিন সকালবেলা এসে হাজির ! আর তারপর থেকেই গুজ্ গুজ্

ফিস্ ফিস্ শুরু হলো। চুপ চুপ থাম্ থাম্! কেউ বললে—নেহরুজী গদী কেড়ে নেবে মহারাজার। কেউ বললে—দিল্লীতে বাদশাহী হয়ে গেছে, বাদশাহী ফৌজ এসে পৌছোলো বলে। শহরময় লোকের মুখে এই এক কথা। কোতোয়ালীতে বন্দুক নিয়ে মহারাজার ফৌজী সেপাই পাহারা দেয়। কৌতূহলী জনতা সামনে এগিয়ে এলেই বলে—ভাগো, সামনে ভাগো—

এখন, ঠিক এই সময়ে দেশে ফেরবার আগে হঠাৎ এই রাজ-পুতানার শহরে এসে পৌছলো উইলী! মেজর উইলিয়াম কার্লাইল স্মিথ্। হিজ মেজেষ্টিজ ফোর্সের ফিফ্‌থ ব্রিগেডের ডাক্তার। অনেক হাত ঘুরে অনেক দেশ-এর ডাকঘরের ঠোক্কর খেতে খেতে সাহেব-বৌদির এক চিঠি তার হাতে পৌছেছে। আর এমন সময়ে পৌছেছে, যখন তাদের দেশে ফিরে যাবার পালা!

তা হোক্। তবু দেশে ফেরার আগে একবার দেখা করতে এল।

সাহেব-বৌদি জিজ্ঞেস করলে—তুই কোথায় উঠেছিস্ উইলী?

—রেস্ট হাউসে।

সাহেব বৌদি বললে—রেস্ট হাউসে কেন, আমার মহলে এসে ওঠ—

উইলী বললে—আমি আজকেই ফিরে যাবো দিল্লী, সেখান থেকে হেড্-কোয়ার্টারের অর্ডার পেলেই রওনা দেব—

হঠাৎ সাহেব-বৌদির কী হলো কে জানে! বললে—তোর সঙ্গে আমিও যাবো—

উইলীও অবাক হয়ে গেছে। বললে—তার মানে? কোথায় যাবে তুমি?

সাহেব-বৌদি বললে—দেশে!

সেকি!

উইলী বললে—বড়ে মহারাজার পারমিশন্ নেবে না—?

সাহেব-বৌদি বললে—আমি কারো বাঁদী নই যে অনুমতি নিতে

হবে—তুই আমার পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে দে,—আমি মাউন্ট আবুতে থাকবো, সেখান থেকে গেলে কেউ টের পাবে না।

উইলী চলে গেল সেই দিনই। কিন্তু পরদিন থেকেই, কে জানে কেন, ফৌজী সেপাইএর ঘোরাঘুরি চলতে লাগলো ইংলিশওয়ালীর প্রাসাদের আশে-পাশে।

সাহেব-বৌদি চিঠি পাঠালেন বড়ে মহারাজার দপ্তরে। মহারাজার খাস্ আম-দপ্তরে। সেখান থেকে অনেক দিন পরেও কোনও উত্তর আসে না তার। সাহেব-বৌদি খাস-মুন্সীকে পাঠান বড়ে মহারাজার কাছে। দেখা হয় না। বলে—বড় পরেশান হয়েছে বড়ে মহারাজার। একবার দু'বার তিনবার দিল্লী গিয়ে প্যাটেলজীর সঙ্গে মোলাকাত করতে হয়েছে এস্টেটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। এখনও কিছু ফয়সালা হয়নি। বড়ে মহারাজার তবিয়ত, মেজাজ, দেমাগ সব বিগ্‌ড়ে আছে এখন। দেখা হবে না—

দেখা হবে না তো, দেখা না-হোক।

হুকুম হয়ে গেল- -ইংলিশওয়ালী মাউন্ট্ আবুর প্যালেসে বেড়াতে যাবে—লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা, সেপাই-শান্ত্রী, ঘোড়ী, উট, বেড়াল, কাকাতুয়া, হাতী, আয়া, বাবুর্চি, খানসামা, হুইস্কি, সোডা, সব তৈরি হয়ে নাও—

আর এই মাউন্ট আবুতেই আমার সঙ্গে সাহেব-বৌদির দেখা।

আজও মনে পড়ে সেদিনকার সাহেব-বৌদির সেই কথাগুলো।

আস্তে আস্তে কথা হচ্ছে। অন্ধকার প্যালেস। দূরে লেকের ওধার থেকে শুধু ভৌতিক ছায়ার মতন গীর্জার চুড়োটা আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। বড়ে মহারাজা তখন প্রায় অচৈতন্য। অসংলগ্ন কথা বলছেন এক-একবার। আবার একবার যেন সম্বিত ফিরে আসছে।

বড়ে মহারাজ ডাকলে—ইংলিশওয়ালী!

ইংলিশওয়ালী ডাকটা বড় আদরের ডাক। বেশি আদর করতে হলে ওই ডাকেই ডাকতো বড়ে মহারাজা।

বললে—ইংলিশওয়ালী!

সাহেব-বৌদি বললে—কী?

মহারাজা—তুমি আর কিছু চাও ইংলিশওয়ালী, আউর কুছ মাঙো—

সাহেব-বৌদি বললে—আর কিছু আমার চাই না—

—তবু কিছু চাও!

সাহেব-বৌদি বললে—আমি দেখলাম বড়ে মহারাজার তখন অচৈতন্য অবস্থা! আমি টাকা-কড়ি-মোহর, হীরে-জহরত যা ইচ্ছে তখন চেয়ে নিতে পারি—তখন বড়ে মহারাজা একেবারে আমার জন্যে পাগল, আমার জন্যে উন্মাদ—

মহারাজ বললে—যা খুশী চাও, গাড়ি, ঘোড়া, প্লেন, হাতী, মোহর—যা তোমার খুশী—

সাহেব-বৌদি বললে—তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ সব কেড়ে নাও—আমি কিছু চাই না—মেহেরবানি করে সব কিছু কেড়ে নাও—

—কেন, আমার ওপর গোসা করেছ তুমি?

—আমার গয়না, আমার গাড়ি, আমার হাতী সব কেড়ে নাও। ও-সব আমি কী করবো নিয়ে? একদিন ও-সব চেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু এখন আর কিছু চাই না—

—কেন? দেমাগ্ বিগড়ে গেছে?

সাহেব-বৌদি বললে—না, আমি ফতেগড়ে এসেছি গদীর জন্যে,—সে আমি এখনও পাইনি—

বড়ে মহারাজার যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এল।

বললে—গদী?

—হ্যাঁ গদী ! আমি রাণীজীর গদী চাই। আমি ফতেগড়ের রাণীসাহেবার গদী চাই ! আমি সুলতানগঞ্জের প্রিন্সেস্ হতে পারিনি তাই তোমার সঙ্গে পালিয়েছি, এখন ফতেগড়ের প্রিন্সেস্ না হতে পারলে আবার · · ·

মহারাজ বললে—ফতেগড়ের প্রিন্সেস্ না হতে পারলে কী করবে ? আবার পালাবে ?

সাহেব-বৌদি বললে—তুমি কি আমাকে ধরে রাখতে পারবে ?

মহারাজ বললে—কোথায় পালাবে তুমি ?

—চেষ্টা করবো আর কোনও স্টেটের রাণী হতে ! এখনও আমার বয়েস আছে, এখনও যৌবন আছে !

—রাণী না হলে তোমার চলে না ?

সাহেব-বৌদি কেঁদে ফেললে। বললে—আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, জানো, হাজার-হাজার মাইল দূর থেকে ! শুধু রাণী হবার জন্যে—যদি রাণী হতে পারি তো টাকা আমি চাই না, আমি তোমার রাওলার এককোণে পড়ে থাকবো—শুধু দুটি খেতে দিও—

মহারাজ বললে—তা হলে আর একটু হুইস্কি খাও—

সাহেব-বৌদি বললে—তুমি হুইস্কি খাইয়ে আমাকে ভুলিয়ে দিতে চাও ? আমি হুইস্কি খাবো না—

—কেন ?

সাহেব-বৌদি বললে—কেন, শুনতে চাও ?

মহারাজ বললে—বলো ! আমার ফতেগড়ে অনেক মেয়ে এসেছে তোমাদের দেশের, তারা তো কেউ হুইস্কি খেতে আপত্তি করেনি !

সাহেব-বৌদি বললে—আমিও আগে খেয়েছি, এখনও খাই—কিন্তু তোমার সঙ্গে রাত্রে একঘরে দরজা বন্ধ করে আর হুইস্কি খাবো না—

—কেন ?

সাহেব-বৌদি বললে—আমার মা যে-ভুল করেছিল, আমি আর সে-ভুল করতে চাই না—

মহারাজা জিজ্ঞেস করলে—তোমার মা কী ভুল করেছিল ?

সাহেব-বৌদি তলোয়ারের মত সোজা ধারালো হয়ে উঠলো হঠাৎ। বড়ে মহারাজা ইংলিশওয়ালীর এ-রূপ আগে কখনও দেখেনি। মনে হলো যেন একটা করাত্ সাপ সোজা ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে তার বিছানার ওপর। অল্প অল্প দুলছে মাথাটা। আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে তার দিকে চেয়ে।

মহারাজা বললে—শোও, শুয়ে পড়ো—আমি চলে যাচ্ছি—

সাহেব-বৌদি খপ্ করে ধরে ফেললে বড়ে মহারাজার হাতটা।

বললে—তুমি পালাতে পারবে না—

মহারাজা বললে—কাল সকালে আমি আবার আসবো, এখন তুমি গরম হয়ে গেছ, একলা থাকো, ঠাণ্ডা হও--

সাহেব-বৌদি বললে—আমি গরম হই না, আমি ঠাণ্ডাই আছি—আমি তোমার আগে অনেক রাত কাটিয়েছি অন্য লোকের সঙ্গে—আমি ইংলিশওয়ালী, কেউ আমায় ঠকায়নি! আমিই সকলকে ঠকিয়েছি! কিন্তু তুমি······

তারপর একটু থেমে বললে—সুলতানগঞ্জের প্রিন্সের কাছ থেকে কেন তুমি আমায় নিয়ে এলে! কেন তুমি আমায় মিথ্যে লোভ দেখালে ?

মহারাজ বললে—তোমাকে আমি দশ হাজার টাকা দিই—তোমার আমি কোনও অভাব রাখিনি—

—কিন্তু তুমি তো আমায় তোমার গদী দেবে বলেছিলে? রাণীর গদী! দিয়েছ তা ?

মহারাজা কিছুক্ষণ কথার উত্তর দিতে পারলে না।

বললে—সুলতানগঞ্জের প্রিন্সও তোমায় রাণীসাহেবা করেনি।

সাহেব-বৌদি বললে—কিন্তু কলকাতায় আরো প্রিন্স্‌ ছিল, আরো প্রিন্স্‌ আমাকে রাণী করতে চেয়েছিল!

বটে মহারাজা বললে—তারা তোমায় আমার মত এত টাকা দিত না!

—হয়ত দিত না, কিন্তু রাণী করতো হয়তো!

—কিন্তু এত রাণী হতেই বা চাও কেন? কেন এত লোভ তোমার রাণী হতে? টাকা পেলেই তো সব মেয়েমানুষ খুশী হয়!

সাহেব-বৌদি বললে—তুমি যাদের দেখেছো, তারা হয়ত টাকাতেই খুশী হয়—কিন্তু আমি মেয়েমানুষ হলেও আলাদা জাতের। আমি ইংলিশওয়ালী!

—আমি আরো ইংলিশওয়ালী দেখেছি!

সাহেব-বৌদি বললে—কিন্তু তারা হয়ত সাঁকোর তলায় জন্মায়নি, তাদের হয়ত বার বার বাপ বদলায় নি, তাদের হয়ত তেরোটা ভাই-বোনাকে মানুষ করতে হয়নি—তাদের হয়ত বাজারে গিয়ে মাছ-মাংস চুরি করতে হয়নি, তারা হয়ত বাবা-মা'র ভালবাসা পেয়েছে—তারা হয়ত রাণী না হয়েও নিজেদের রাণী বলে প্রচার করেনি—

বলে কাঁদতে কাঁদতে মহারাজার বুকের ওপর সাহেব-বৌদি ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

মহারাজা উঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো সাহেব-বৌদির পিঠে। বহু পুরুষ এমন করে হাত বুলিয়ে দিয়েছে আগে। ঠিক তাদেরই মত হাত, ঠিক তাদেরই মত আদর। কোনও তফাত নেই। বহুদিন আগে অলক এমনি করে হাত বুলিয়েছে। সুলতানগঞ্জের কুমারসাহেবও হাত বুলিয়েছে। আরো কত অসংখ্য নাম-গোত্রহীন হাতের স্পর্শে সাহেব-বৌদির আত্মা কলঙ্কিত হয়েছে তার ঠিক নেই। যেমন করে তার মার দেহ কলঙ্কিত হয়েছে, তেমনি করে হয়েছে সাহেব-বৌদিরও। স্বদেশ-বিদেশ পূব-পশ্চিম সর্বত্র এক।

হঠাৎ মনে হলো বড়ে মহারাজা হাতখানা তার পিঠ থেকে যেন সরিয়ে নিচ্ছে। যেন নিঃশব্দে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

সাহেব-বৌদি কিছু বললে না। তখনও ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। ঘাড় গুঁজে বালিশে চোখ মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। বোঝা গেল—বড়ে মহারাজা আস্তে আস্তে উঠছে। বিছানা ছেড়ে দরজা পার হলো। অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রে তার টিপি টিপি পদসঞ্চার নিস্তরঙ্গ বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর তারপর একবার নিচের কোরিডরে মহারাজার গাড়ির ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ হয়ে তা ক্রমে থেমেও গেল।

আমার সামনেই বার কয়েক সাহেব-বৌদির আয়া এল। মুখে ভালো করে পাউডার দিয়ে রুজ মাখিয়ে চোখের ভুরু এঁকে দিয়ে গেল! মাথায় যে-চুলটা উড়ছিল সেটা ঠিক করে আঁচড়ে দিলে! কথার মধ্যেই সাহেব-বৌদির বেরাল এসে কোলে বসলো একবার। কুকুরটা এসে পায়ে মাথা ঘসতে লাগলো। সমস্ত লক্ষ্য করতে লাগলাম।

সাহেব-বৌদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আবুতে এসেছিলি কেন?

বললাম—কেন, এখানে আসতে নেই?

মনে আছে নিস্তব্ধতার মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমার কোনও ছেলে-মেয়ে হয়নি সাহেব-বৌদি?

আমার কথার কোনও জবাব দিলে না সাহেব-বৌদি।

তারপর আর কী প্রশ্ন করবো ভাবছি, হঠাৎ একবার সাহেব-বৌদি বললে—তুই এখান থেকে আজই চলে যা—

অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম—কেন?

সাহেব-বৌদি জিজ্ঞেস করলে—এখানে তোর কি দরকার?

বললাম—তেমন কোনও দরকার নেই—এমনি বেড়াতে এসেছি—

সাহেব-বৌদি বললে—তা হলে আজই চলে যা—

—কেন ?

সাহেব-বৌদি বললে—এখানে থাকলে তোর বিপদ হবে।

—বিপদ ! বিপদ আবার কিসের !

সাহেব-বৌদি একবার গ্লাসে চুমুক দিলে। বললে—আমি আজ রাত্রেই পালাবো—

আমার বিস্ময়ের যেন সীমা ছিল না সেদিন। বলেছিলাম—কেন, কোথায় পালাবে ? পালাবে কেন ?

লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে সাহেব-বৌদি কোলের বেরালটার গায় হাত বুলোতে লাগলো। বললে—এই এদের সব ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাকে। আমার হাতীটার একটা বাচ্চা হয়েছে শুনেছিলাম, তা-ও আর দেখতে পাবো না, আমার ঘোড়া এবার কলকাতায় ভাইস্‌রয়ের কাপ পেয়েছে, জানিস্ ?

তারপর সিগারেটে আর একবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লে।

বললে—তা হোক, একটা জীবনে অনেক কিছুই তো অভিজ্ঞতা হলো—বস্তি থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত—কিচ্ছু আর বাকি নেই, সেই একই ঘটনা একই অভিজ্ঞতা—কোনও তফাত নেই।

বললাম—কোনও তফাত নেই ? কিন্তু ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের চেয়েও তো সুখে আছো এখন ?

সাহেব-বৌদি যেন কী ভাবলে। বললে—সুখ !

তারপর বললে—আমার সুখের দরকার নেই—

বললাম—রাণীসাহেবা হয়েছ তবু তোমার সুখ নেই ?

সাহেব-বৌদি বললে—রাণীসাহেবা আর কই হলুম, আমার সবটাই কেবল ছদ্মবেশ, বটে মহারাজা আমাকে বিয়েই করেনি—

সে কি ! এই রাজপ্রাসাদ, এই লোক-জন, হাতী ঘোড়া, এত সাজসরঞ্জাম সব মিথ্যে !

সাহেব-বৌদি বললে—আমার রাণীসাহেবা হওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত!

—কেন?

সাহেব-বৌদি বললে—একদিন দিল্লী থেকে বড়ে মহারাজার নামে চিঠি এল, মার্জারে সই করতে হবে, প্যাটেলজী ডেকে পাঠিয়েছে – আয় কমে গেল মহারাজার—বড় মন-খারাপ হয়ে গেছে তার—

সাহেব-বৌদি আবার গ্লাসে চুমুক দিলে! তারপর সোনার পাইপে সিগারেটের ধোঁয়া টেনে বললে—আমি আজ রাত্রেই তাই চলে যাচ্ছি—

বললাম—এবার কোথায়?

সাহেব-বৌদি বললে—এবার ভাই ফিরে যাবো বিলেতে।

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। বললাম—সত্যি ফিরে যাবে এতদিনে?

সাহেব-বৌদি বললে—হাঁ, না-পালিয়েও আর উপায় নেই, আমি যে এতদিন বে-আইনী করে বিলেতে টাকা পাঠিয়ে এসেছি, তা'ও গবর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিয়েছে মহারাজা, তা ছাড়া আর ভালো লাগে না এখানে, এখন তো বিলেতে আমার নিজের বাড়ি হয়েছে, আবার সেই নিজের দেশেই গিয়ে কাটাবো! অনেক দেখেছি, অনেক শিখলাম। যাদের ঘৃণা করে এতদিন দূরে চলে এসেছিলাম, এখানে এসেও সেই ঘৃণার হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। যারা আমাকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে রাস্তায় ঘাটে সেলাম করে, তারাই কি ভাবিস্ আমাকে ভালোবাসে?

বললাম—ভালোবাসে না?

সাহেব-বৌদি বললে—না, দেখ্‌না আমার বাবা একদিন আসছিল পশ্চিমদিক থেকে আর মা আসছিল উত্তর দিক থেকে—মোড়ের মাথায় এসে তাদের দেখা হলো আর তার ফলেই হলো আমার জন্ম!

এই দুর্ঘটনাই দেখলাম সর্বত্র—রাস্তার সাঁকোর তলা থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদের হারেম পর্যন্ত—সর্বত্র !

বললাম—বড়ে মহারাজা ছাড়বে তোমাকে ?

সাহেব-বৌদি বললে—ছাড়বে না বলেই তো লুকিয়ে পালাচ্ছি—

তারপর একটু থেমে বললে—তুই আজই চলে যা, কালকেই সারা আবুতে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, বড়ে মহারাজা ক'মাস থেকেই সন্দেহ করছে, এখানেও আমার পেছনে চর পাঠিয়েছে—তাই বলছি তুই চলে যা এখান থেকে—

বললাম—কী করে যাবো ?

সাহেব-বৌদি বললে—তোর হাওয়া-মহলে রাত্রেই গাড়ি পৌছিয়ে দেব, তৈরি হয়ে থাকিস—তোকে অনেক দূরে পৌছে দেবে—

বললাম—আর তুমি ?

সাহেব-বৌদি বললে -আমি ? আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না।

বললাম—তবু তোমার যাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে ?

সাহেব-বৌদি আবার সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। বললে—আমার যাওয়ার ব্যবস্থা তোকে ভাবতে হবে না—উইলী ইণ্ডিয়াতে এসেছে—সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে আমার জন্যে—

মনে পড়লো এ-ঘটনার বহুদিন পরে একদিন গিয়েছিলাম রোহিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। মনে হয়েছিল একদিন সেই মিথ্যে জয়োল্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম, তার লজ্জা আমার দূর করতেই হবে !

পঞ্চা বলেছিল—অর্জুন স্যার—

সুবোধ বলেছিল—ভীম স্যার—

ফটিক বলেছিল—কর্ণ স্যার –

আর আমি? আমি বলেছিলাম—যুধিষ্ঠির!

অথচ সবাই জানে পৃথিবীর জয়মাল্য যুধিষ্ঠিররাই বরাবর পেয়ে থাকে! আমিও তাই জানতাম তখন। কিন্তু আজ জেনেছি অন্য-রকম। আজ জেনেছি জয় আর পরাজয়ের মধ্যে আর কোনও পার্থক্য নেই। দেখেছি মানুষের কাছে হার স্বীকার করে কতজন বিধাতার কাছে জয়মাল্য পেয়েছে। আবার দেখেছি মানুষের কাছে জয়ী হয়ে বিধাতার কাছে হিসেব দিতে গিয়ে লজ্জায় মুখ নিচু করতে হয়েছে কতলোককে। আবার আজ যা'কে জয় বলি, কাল তা পরাজয় হয়ে গেছে রাতারাতি! কে সার্থক, কে ব্যর্থ, কে তার বিচার করবে!

শ্রীশুকদেব সব জানতেন। তাঁর জানতে কিছুই বাকি ছিল না। কিন্তু তিনিও কি জানতেন সব পাপ পাপ নয় এবং সব পুণ্যও পুণ্য নয়? তিনি কি জানতেন ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জয়-পবাজয় সমস্ত কিছুর সমষ্টি নিয়েই মানুষ! আর সেই মানুষেব মাপকাঠি পুঁথি নয়, শাস্ত্র নয়, বিদ্যা নয়, জ্ঞান নয়—অন্য কিছু! আর সেই অন্য কিছুর নামই হলো ইতিহাস-বিধাতা!

কিন্তু বাড়িতে গিয়ে শুনলাম রোহিনীবাবু এ-সংসারে আর নেই!

মনে আছে সেদিন রাত্রে ফিরে এসে সমস্তক্ষণ কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। আবু পাহাড়ের শীতের মধ্যেও আমি যেন ঘামতে লাগলাম। দূর থেকে গীর্জার ঘণ্টা পনরো মিনিট অন্তর বেজে চলেছে। শব্দের তরঙ্গ যেন সমস্ত পাহাড়ে ভাসতে ভাসতে অনন্ত কালে গিয়ে মিশছে। বাইরের সামান্যতম শব্দেও যেন চমকে উঠতে লাগলাম। মনে হলো যেখানেই যাক সাহেব-বৌদি যেন সুখে থাকে। দূরে আকাশের কোন্ কোণে একটা পাখী ডেকে উঠলো। কুক্ কুক্ শব্দ! পাহাড়ী পাখীর আর্তনাদ বুঝি? টপ্ টপ্ করে শিশির পড়ছে

জানলার টিনের ওপর। একটা গাছের পাকা পাতা বুঝি খসে পড়লো নিঃশব্দে! অঙ্কুর জেগে উঠলো ঘাসে, কিশলয় চোখ মেললো।

আমি কান পেতে আছি। সাহেব-বৌদির গাড়ি আসবে। আর তারপর কাল সকালেই পুলিশ আসবে। সমস্ত শহরে সন্ধান চলবে। কোথাও পাওয়া যাবে না সাহেব-বৌদিকে! বহুদিন বহু রাত্রির পর আবার বাড়ি ফিরে যাবে সাহেব-বৌদি।

আবার সংসার শুরু করবে। এবার আর ঘৃণা নয়। উইলী যুদ্ধ থেকে ফিরে গিয়েই বিয়ে করবে। ম্যাটিল্ডার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তারপব মিমির বিয়ে হবে! তারপব হেনরি, মার্টিন—সকলের সংসার হবে। সাহেব-বৌদি তাদেরই একজন। তাদেরই আত্মীয়। আমাদের কেউ নয়। লম্বা গাউন পরে গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করবে—"The Time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand, repent ye .."

আর সে-সব দিনের কথাও মনে আছে। হাওড়া-স্টেশনে, এরো-ড্রোমে, খিদিবপুবেব ডকে। একে একে শেষ ইংরেজটি পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছেড়ে একদিন চলে গেল। চৌবঙ্গীতে, ট্রেণে, সিনেমায় তাদেব আব এখন দেখা যায় না। তিরিশ-চল্লিশ বছব আগে তাবাই একদিন নিবীহ লোকদেব মাথায় ছড়ি মেবে বাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে। বলবাব কেউ নেই, প্রতিবাদ করবাবও কেউ নেই। আমরা প্রাণপণে ইংবেজী শিখেছি। ইংরেজীর স্বপ্ন দেখেছি, নির্ভুল করে কোট প্যাণ্ট টাই পবতে চেষ্টা করেছি। পুবো সাহেব হতে চেষ্টা করেছি। তবু আমরা সাহেবদের চোখে পথমে ছিলাম নেটিভ, তারপরে বাবু। আমবা সাহেব হতে পারিনি সে কি আমাদের কম দুঃখ! কিন্তু আজ সে-সব অতীত ইতিহাস। আজকের তোমরা শুধু মনে রেখো—সেদিন সব ইংরেজ ছেলে-মেয়েরা চলে গেলেও একজন শুধু যেতে

পারেনি। একজন শুধু পেছিয়ে পড়েছিল। একজন আজো আবু পাহাড়ের পাথুরে মাটির তলায় অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে চির-বিশ্রাম করছে। সে হারিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর ভিড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পথ রথ হারিয়ে ফেলেছে। তার নাম নোরা স্মিথ! সে আমার সাহেব-বৌদি!

সে গল্পটাই বলি!

যখন ঘুম ভাঙলো—চেয়ে দেখি সকাল হয়ে গেছে।

গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। আবু-পাহাড়ের চারিদিকে তখনও কুয়াশা। সূর্যের আবছা আলো এসে পড়েছে টোড-রকের মাথায়। ওদিকে সান-সেট্ পয়েণ্টের দিকে ঝাপসা অন্ধকার।

কেমন যেন হতবাক হয়ে গেলাম। তবে কি গাড়ি পাঠায়নি! না আমিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গাড়ির হর্ন শুনতে পাইনি হয়ত। জামা-কাপড় পরে রাস্তায় গেলাম। রাস্তায় তখনি ভিড় জমে গেছে। অনেক পুলিশ। অনেক পাহারা। চারিদিকে শশব্যস্ততা! চাকর-বাকর লোক-লস্কর। তবে কি সবাই জেনে গেছে! সাহেব-বৌদির অন্তর্ধানের খবর এরই মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে! কিন্তু কাছে যেতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

কালকের সেই লোকটা আমাকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে কাছে এসেছে। এসে যথারীতি সেলাম করে দাঁড়াল। বললাম—ছঁজুরাইন কোথায়?

লোকটা বললে—হুঁজুরাইন নেই হুজুর—

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় গেছে?

লোকটা বললে—মারা গেছে হুজুর—

পাদরি-সাহেবের দেওয়া সেই বাইবেলের পাতাগুলো উল্টোতে উল্টোতে সেদিন সব মনে পড়েছিল আবার। বড়ো মহারাজা

সাহেব-বৌদির পেছনে চর লাগিয়েছিল। হয়ত সন্দেহ করেছিল। হয়ত সবই টের পেয়েছিল বড়ে মহারাজা! আমায় গাড়ি পাঠাবার আগেই সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে হয়ত। হয়ত প্রথম রাত্রেই ঘটনাটা ঘটেছে। নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণের জন্যে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল সাহেব-বৌদি। থমথমে রাতের অন্ধকারে হয়ত কেউ আগে থেকেই ঘরে ঢুকে বসে ছিল। জানতে পারেনি সাহেব-বৌদি। তারপর যখন হাওয়া-মহলের সব শব্দ চুপ হয়ে গেছে—তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে···

তারপর ভোর হয়েছে মাটির পৃথিবীতে। একে একে চেতনা-সঞ্চার হয়েছে। সবাই জেগে উঠেছে। সাহেব-বৌদির তখনও ঘুম ভাঙেনি। ওদিকে এরোড্রোমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে উইলী হয়ত এক-সময় আশাই ছেড়ে দিয়েছে। দিদিকে সে তো চেনে। প্লেনের টিকিট, পাশপোর্ট সমস্ত নষ্ট হয়েছে! সমস্ত ব্যর্থ—সব আয়োজন নষ্ট! গীর্জার ঘড়িতে আবার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো—"The Time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand...repent ye......Amen.

আজো আবু পাহাড়ের গীর্জার উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে চারিদিকে সারি সারি সমাধি-স্তম্ভ। নানা লোকের সমাধি। তারই মধ্যে সাহেব-বৌদির সমাধির ওপর একটা সাদা পাথরের গায়ে শুধু লেখা আছে :

Here lies
a lady
who lived as she liked and died happy.

বিদেশী একটি মহিলার জন্যে আমায় খরচ করতে দেখে গীর্জার পাদরি সাহেব হয়ত সেদিন অবাকই হয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করেছিল—মিস্ নোরা স্মিথ্ আপনার কে হতেন ?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এসেছিলাম সেদিন। বুড়ো পাদরি সাহেব আমার কথা হয়তো বুঝতে পারতো না। আর কে-ই বা বুঝতে পারতো! কে বুঝতে পারতো সাহেব-বৌদির জীবনের সার্থকতা!

(একদিন নদী বলেছিল—আমি সমুদ্র হবো। তাই বুঝি কোথাকার কোন্ পাহাড়ের চূড়ো থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মিশেছিল সমুদ্রে। নদী আজ সমুদ্রই হয়েছে, কিন্তু তার সমুদ্র হওয়া যে আজো শেষ হলো না, সেই-ই কি তার কম সুখ!)